উৎস মানুষ

৩৪ বর্ষ • ২য় সংখ্যা • এপ্রিল-জুন ২০১৪

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আহরণ	অজানা চৌধুরি	২
এক জ্ঞানতপস্বী	ফাধনী সেনগুপ্ত	৪
যদি কিছু শিখতে পারতাম	বরুণ ভট্টাচার্য	৬
গণবিজ্ঞান আন্দোলন	তুষার চক্রবর্তী	৭
রবীন্দ্রগানে বিজ্ঞান	আশীষ লাহিড়ী	১০
সনাতন বিশ্বাস	জয়দেব গুপ্ত	১২
পাঠানি চন্দ্রশেখর	সমীরকুমার ঘোষ	১৮
শ্বেতশুভ্র পাঁচটি বিষ	গৌতম মিস্ত্রি	২১
কলকাতার পুকুর	মোহিত রায়	২৫
মধুর সন্ধানে কটি চরিত্র	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
কলকাতা বইমেলা কেমন হল		৩১
কোথায় বিজ্ঞান মানসিকতা	বিবর্তন ভট্টাচার্য	৩২

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয় খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০ ১৩৬

ফোন ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/

৯৮৩১৪৬১৪৬৫

ওয়েবসাইট www.utsamanush.com

ই-মেল utsamanush1980@gmail.com

ভাগ্যিস গরিবরা আছে!

মহাসমারোহে শুরু হয়ে গিয়েছে ভোট। প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই একটাই লক্ষ্য, পণ, কর্মসূচি– গরিবদের সেবা করা, তাদের জন্য প্রাণপাত করা। এ প্রসঙ্গে একটা জনপ্রিয় হিন্দি গানের কলি মনে আসছে– হমে অওর জিনে কি চাহত না হোতে, অগর তুম না হোতে। তুমি না থাকলে আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাই থাকত না। গরিবদের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের এত মাথাব্যথা দেখে প্রশ্ন জাগে, যদি সত্যি গরিব বলে কেউ না থাকত বা হঠাৎ কোনো মন্ত্রবলে ভারত থেকে গরিবি একেবারে হঠে যেত, তাহলে কী হত! গণ্ডা গণ্ডা রাজনীতিক, যাঁরা গরিবদের কথা না ভেবে সকালে এক গ্রাস অন্নও মুখে তোলেন না, জনগণের জন্য কিছু করতে না পেরে বেকার হতেন, গরিবদের জন্য জীবন দিতে না পেরে তাঁদের জীবন বিফলে যেত। গভীর দুঃখে তাঁরা নিজের জীবনও দিয়ে দিতে পারতেন। শুধু রাজনৈতিক নেতা কেন, গরিব না থাকলে কী করতেন মাদার টেরিজা, তাঁর মিশনারিজ অভ চ্যারিটি, বিবেকানন্দ, তাঁর রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, আল আমিন মিশন ইত্যাদি প্রভৃতি আরও কত কত গরিববন্ধু সংস্থা ও মানুষেরা! তার চেয়েও বড় কথা বিবেকানন্দ, টেরিজা, গান্ধীদের তো জন্মই হত না। তাহলে বাঙালি জাতটার কী হত! কাকে নিয়ে বাঁচত। ওঁদের কথা ভেবেই কি কবি বলেছেন– হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান, তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিষ্টের সম্মান।...

বড়, গুরুজনদের কথা ছেড়ে এবার নিজেদের কথা। এবারের বইমেলাতেও উৎস মানুষ যোগ দিয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পর দু-দুটো নতুন বইও ছিল। মেলায় বিপুল মানুষ সোৎসাহে হামলে পড়েছে। চাউমিন, বিরিয়ানি খেয়েছে, বই কেনে নি। তা না হোক, স্টলে অনেকের সঙ্গে দেখা হল, কথা হল। কেউ কিছু প্রস্তাব দিলেন, কেউ সমালোচনা করলেন বা অনুযোগ। এটাই বা কম প্রাপ্তি কিসের!

সম্প্রতি আমাদের একজন পরম বন্ধু অজানা চৌধুরি প্রয়াত হয়েছেন। অজানা পেশায় আবহাওয়া বিজ্ঞানী ছিলেন। উপেক্ষার আড়াল থেকে রাধানাথ শিকদারকে সামনে নিয়ে আসায় তাঁর কৃতিত্ব অনেকখানি। শুধু তাই নয়, নানা বিষয়ে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। পত্রিকায় লিখেছেন, বহু লেখার খোরাকও জুগিয়েছেন। বয়স এতটুকু কমাতে পারেনি তাঁর জানা ও কাজ করার উৎসাহকে। এমন শুভানুধ্যায়ীকে হারানো আমাদের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি।

আহরণ-এর বিকল্প

আগে বিজ্ঞান, পরে তো রাজনীতি!

অজানা চৌধুরি

আবহবিজ্ঞানের ইতিহাসকে যদি গ্রীক যুক্তিবাদের সময় থেকে পর্বায়ন করি তবে পর্বগুলো দাঁড়াবে এইরকম— (১) মেলিস (Thales of Miletus)-এর আনুমানিক সময়কাল ৬৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ।

এই সময়কাল ধরে Aristotle এবং তাঁর শিষ্য Theophrastus এবং অন্যান্যদের অনুমাননির্ভর আবহবিদ্যার রাজত্বকাল চলেছে। যুক্তি-তর্ক অবশ্যই ছিল কিন্তু মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ নিয়ে কথার কোনোটাই পরীক্ষিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। Aristotle-এর Meteorologica শুধুমাত্র Mythology-র ঘেরাটোপ থেকে আবহাওয়া তত্ত্বকে সরিয়ে এনেছিল যুক্তি-তর্কের আসরে। Theophrastus-এর পূর্বাভাস ছিল মুখ্যত জন্তু-জানোয়ারের আচরণবিধি লক্ষ্য করে। বাতাসের ওজন ছিল না, মেঘ ও তীব্র বাতাসের ঘর্ষণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন ইত্যাদি। এই চিন্তাধারাই ছিল মধ্যযুগের ইয়োরোপে। চতুর্দশ শতক থেকে কিছু অন্যরকম চিন্তা ছিল। লিওনার্দো অন্যতম। এদেশে 'বর্ষমান' (বৃষ্টি-পরিমাপক) কৌটিল্যের আগে থেকেই বর্তমান ছিল। রোমান Wind Tower ব্যাবিলনের বাতাসের দিশা-অনুসারী। বৃহৎসংহিতায় কিছু মেঘের description। এগুলো কিছু কিছু exception। এই অনুমানভিত্তিক আবহবিদ্যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৫৩ থেকে। (২) সুতরাং দ্বিতীয় পর্ব ধরা যায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ। এই দ্বিতীয় পর্বে আবহ-পরিমাপের sensorগুলোর একে-একে আবিষ্কার ও পরিমার্জন হয়েছে দুই শতক জুড়ে। একটা interesting ইতিহাস। এই দুই শতক বহু মনীষীর মনস্বিতায় পূর্ণ— Galileo, Newton, Kepler etc. etc.— পদার্থবিদ্যা, গণিতে, রসায়নে এইসময় যা কিছু সংযোজিত হয়েছে সবকিছুরই নানা অবদানে আবহ-বিজ্ঞানের মূল পরিকাঠামোটি রচিত হয়েছে।

এই দুই শতক বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেউ যদি লেখে তবে বহু কিছু রয়েছে লেখার। তবুও আবহবিজ্ঞান এইসময়ে ছিল নিতান্তই পরমুখাপেক্ষী শৈশবে। (৩) তৃতীয় পর্ব শুরু হয় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ কিংবা ১৯৫০ও বলা যায়।

এইসময় সম্পূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে সামুদ্রিক ঝড় এবং সমুদ্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে বহু কাজ শুরু হয় আমেরিকায়। সেই কাজের সূত্র ধরে এখানে কিছু ঝড়ের কথা লেখেন H. Piddington। ইনি নিজে একজন নাবিক, President of Marine Court Enquiry পরবর্তীকালে। (এর কাজগুলোর summarize করার চেষ্টা আমি Asiatic Society-তে করেছিলাম। একে নিয়ে Mr. Sensharma একটা লিখেছেন Weather-এ।)

বায়ুসমুদ্র ও জলসমুদ্র এই দুটো প্রকাণ্ড Heat Engine (যা তাপশক্তিকে রূপান্তরিত করে গতিশক্তিতে)— dynamically Coupled। একের অভিঘাত পড়ে আরেকটির ওপরে। ফলে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের পরিধি হল বিস্তৃত— স্থলে এবং জলে।

ঊনবিংশ শতকের ষাটের দশক থেকে বাতাসের Three-dimensional structure নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হল। বেলুন উড়ল— নানা কলাকৌশল যুক্ত হতে লাগল।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি বাতাসের মধ্যে যে physical and dynamical processগুলো হচ্ছে— তা নিয়ে বিশদ আলোচনা শুরু হল Thermodynamics ও Hydrodynamics-এর নতুন উদ্ভাবিত সূত্র ধরে। বাতাসে একইসঙ্গে থাকে বাষ্প, জল আর বরফের টুকরো— অর্থাৎ জল তিন অবস্থাতেই— এই phase transformation-এ বাতাসের তাপ, চাপ বিভিন্ন উচ্চতায় কীভাবে বদলায় তার স্পষ্ট ছবি না তৈরি হলে বায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াকলাপ বোঝা শক্ত। একটা closed laboratoryর experiment-এর ফলাফল বিশ্বপ্রকৃতির open laboratory-তে যে সম্পূর্ণভাবে এক হতে পারে না এ কথা বলাই বাহুল্য।

এই শতকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল quick collection and dissemination of weather data। সেটা সম্ভব হয়েছিল

Radio, Telegragh সহযোগে এবং পরবর্তী সময়ে satellite। এই quick communication system-এর ফলেই Synoptic Weather Forecasting সম্ভব হয়েছে।

Synoptic study concept-এর আরম্ভ এবং preparation of synoptic maps এই ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে। Asiatic Societyর Journal-এ কলকাতায় এই synoptic map আলোচনা রয়েছে। (Synoptic map বলতে বোঝায় মোটা দাগে— analyse of simultaneous weather observations over various space scales— ranging from national to global area coverage.)

Synoptic mapকে বলা যায় *threshold of modern meteorology*.শুরুটা 1823 সালে। এই map-কে Weather Forecasting-র চক্ষুদান পর্ব বললে ভুল হবে না।

1864 সালে একটা সামুদ্রিক ঝড় জাহাজটাহাজ তছনছ করে কলকাতাকে বিপর্যস্ত করে যায়। বাণিজ্য কেন্দ্রের এই অবস্থায় Bengal Chamber of Commerce সরকারের কাছে দরবার শুরু করে। তখন ইংল্যান্ডে forecasting দিচ্ছেন Robert Fritz Roy (1861) Henry F. Blanford তখন Geological Survey-তে।

এই ঝড় নিয়ে যে report তৈরি হয় তাতে রাধানাথের নাম উলটো-পালটা দেওয়া আছে। রাধানাথ তখন retire করেছেন। Asiatic Societyর Meteorological Committee – তেও নেই।

যাই হোক, এই সময় হাল ধরলেন Blanford। বহু পত্রাঘাত, পশ্চাদ্‌পসরণের পর চালু হল forecasting। Observatory— Survey Dept— অফিস Asiatic Society 1867-1874 পর্যন্ত এইভাবে। ১৮৭৫-এ আলিপুরের লালবাড়ি এবং স্থানান্তকরণ। ১৮৭৭-এ Survey of India-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন। 1875-77 দুই observatoryতেই simultaneous obs.।

এই হচ্ছে মোটামুটি ইতিহাস। মাদ্রাজে Petrieর Met. obs.কে উনি 'শখ' বলেছেন। তা কিন্তু নয়। ব্রিটেনের Ordnance Dept.থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো এবং নির্দেশনামাও ছিল জমি-জরিপ, hatbour-making এর— উপনিবেশ গড়তে হবে তো। এই দুটো কাজেই met.observation দরকার।

মাদ্রাজে ছিল Astronomical Observatory কলকাতার Fort William-এও অনুরূপ একটি। এই দুটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর একটি reference meridian গড়ে তোলা Greenwich meridian-এর মত। তার referenceএ জমি-জরিপ শুরু হবে। হয় নি। এই কাজে Atmospheric refraction জানা দরকার। Atmospheric refraction depend করে বাতাসের Barometric এবং Thermometric-এর ওপর।

এখানে বলা দরকার বলে বলছি— Asiatic Society Journal যে-সব meteorological data ছাপা হয়েছিল সেগুলো সবই ''Utterly useless'' বিবেচনা করা হয় পরবর্তীকালে। বহু meteorological articleও অন্তঃসারশূন্য। এই মন্তব্য আমার নয় Col. Strachey-র। এই ভদ্রলোক পরবর্তীকালে Govt. (British)-এ meteorological advisor ছিলেন।

শুধুমাত্র রাধানাথের data অতীত কলকাতার Climate Historyকে ধরে রেখেছে। এটা নিয়েই Meteorological Dept.-এর প্রথম Memoir। নাম নেই রাধানাথের!

পুঁজিবাদের সঙ্গে Trade Wind কে বাঁধতে চেয়েছেন সুজনবাবু। বাঁধুন। কিন্তু সামন্তন্ত্রের বাণিজ্যপথও এই হাওয়ার মধ্যে দিয়েই ছিল। এই regular বায়ুপ্রবাহের খোঁজ রাখত রোমান বাণিজ্যতরীও। যাক্ গে। কিন্তু এই বায়ুপ্রবাহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যে Halley (Astronomer Royal) এবং Hadley করলেন, তাঁদের কথা কই?

আগে তো বিজ্ঞানটাকে ভালভাবে তুলে ধরতে হবে,— পরে রাজনীতি।

ইতিহাস যাঁরা পড়েন তাঁরা সবাই দেখেছেন Trade এবং War একদেশ থেকে অন্যদেশে সংস্কৃতি বহন করে নিয়ে যায়। একটার সঙ্গে মালিন্য, দুঃখ, ধ্বংস জড়িত থাকে না— আরেকটার সঙ্গে থাকে। ইংরেজ এদেশে এসেছিল বাণিজ্যের স্বার্থে, রণতরী সাজিয়ে— ক্ষতি অনেক দিয়েছে এদেশ— সংস্কৃতিটা রয়ে গেছে। এই সংস্কৃতির মধ্যে মিশে গেছে অনেক ভারতীয় চিন্তাধারা অনেক ভারতীয়ের কর্মশক্তি ও মননশক্তি। খোঁজ কি রাখি আমরা? শুধু গদগদ হই ইংরেজের কৃতিত্বে!

পুনঃ উৎস মানুষে আবহাওয়া নিয়ে বছর দুই আগে কিছু লেখা জমা পড়ে। সেগুলো দু-একজন আবহাওয়া বিজ্ঞানীকে দেওয়া হয়। তাঁদের নির্বাচিত লেখাগুলো পত্রিকায় ছাপাও হয়। অজানাদিকে যে লেখাটি দেওয়া হয়েছিল তা ওঁর পছন্দ হয়নি। মতামত জানিয়ে বরুণ ভট্টাচার্যকে যে চিঠিটি লেখেন তারই অংশ বিশেষ এই লেখাটি। এতে আবহবিজ্ঞানের শুরুর অনেক কথাই চলে এসেছে। সেই কারণেই তা পাঠকদের কাছে পেশ করা হল। **উমা**

অজানা চৌধুরি, এক জ্ঞানতপস্বী

ফাধনী সেনগুপ্ত

(৩০.১.১৯২৮ - ১৬.১.২০১৪)

কলকাতাতেই ১৯৩১ সালের ৩০ জানুয়ারি জন্ম অজানা চৌধুরির। চার ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট। বাবা সুবোধচন্দ্র গুহ ছিলেন ঢাকা বিক্রমপুরের বিখ্যাত গুহ পরিবারের সন্তান। সুবোধচন্দ্র অবশ্য পারিবারিক বিষয়-আশয় ছেড়ে কলকাতাকেই বেছে নেন কর্মক্ষেত্র হিসাবে। পারিবারে আর্থিক স্বাচ্ছল্য না থাকায় ছোটবেলায় লেখাপড়া টানা করতে পারেননি। দু বছর পড়ে ছাড়তে হয়েছিল ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল। পরে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। তখন বয়স মাত্র ১৩। প্রথম ডিভিসনেই পাস করেন। তারপর বেথুন কলেজ থেকে আই এসসি এবং বি এসসি পাস করেন ডিস্টিংশন নিয়ে। সেই সময়েই দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে বিখ্যাত ৪২-এর আন্দোলন। সুবোধবাবুর আর্থিক সঙ্গতি তেমন না থাকলেও দেশপ্রেম কম ছিল না। ভাড়াবাড়িতেই আশ্রয় দিতেন বিপ্লবীদের। এর জন্য বহুবার পুলিশ হানা দিয়েছে তাঁদের বাড়িতে। দাদা রূপক ছিলেন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের সময় জেলও খেটেছিলেন। এগুলোর গভীর প্রভাব পড়ে অজানার মনে। ফলে কলেজে পড়াকালীন তিনিও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন সমাজকর্মী হয়ে ওঠেন। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকায় কয়েকবার গ্রেপ্তারও হতে হয়েছে। তার মাসুল গুনতে হয় পরে। পুলিশের খাতায় নাম থাকায় সরকারি চাকরি প্রায় হাতছাড়া হতে বসেছিল।

বি এসসি পাস করার পর শিবপুর বি ই কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ভর্তি হন। তখন খুব কম মেয়েই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত। নানা কারণে শেষমেশ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া আর হয় না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে এম এসসিতে ভর্তি হন পিওর ফিজিক্স নিয়ে। সেই সময়েই অশান্ত হয়ে ওঠে কলকাতা। শুরু হয় কুখ্যাত গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এবং তার পরে পরেই ৪৬-এর দাঙ্গা। অজানারা থাকতেন রাজাবাজারের কাছেই। দাঙ্গার ডামাডোলে কোথায় হারিয়ে যায় বইপত্র ও নোটস। এদিকে আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না যে, আবার বইপত্র কিনে নেবেন। তখন বিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সায়েন্স কলেজেই অধ্যাপনা করতেন। তিনিই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। নিজের বহু ব্যক্তিগত বই অজানাকে দিয়ে দেন। এই ঘটনার কথা শেষ জীবনেও ভোলেননি অজানা। পুত্র ও নাতিনাতনিদের কথায় কথায় প্রায়ই বলতেন ছাত্রদরদী অধ্যাপক বসুর কথা। এম এসসি পাস করার পর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে পড়াতে শুরু করেন। তার মধ্যে উল্লেখ্য কলকাতার ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল ও আসানসোলের উইমেন'স কলেজ। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে ইন্ডিয়া মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে সায়েন্টিক অফিসারের চাকরি পান। সেই সময় তিনজন মাত্র মহিলা সায়েন্টিফিক অফিসার ছিলেন। অজানা ছিলেন তাঁদেরই একজন। ১৯৯১ সালে অবসর নেন এগ্রিকালচারাল মেটিওরোলজিক্যাল বিভাগের অধিকর্তা হিসাবে।

আই এম ডি-তে চাকরি করা কালীনই বহু পত্রপত্রিকায়

তিনি জনপ্রিয় বিজ্ঞান নিয়ে লেখালিখি শুরু করেন। আকাশবাণীতে এবং পরে কলকাতা দূরদর্শনে বহু বক্তৃতা করেন। প্রফেসনাল জার্নালেও বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে অনেক। সায়েন্টিফিক কনফারেন্সে পাঠ করেন গবেষণাপত্র।

অবসর নেওয়ার পরে মেতে ছিলেন বিজ্ঞানের ইতিহাস, সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান, ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাধানাথ শিকদারের অবদান, ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে আবহাওয়া বিজ্ঞানের পরিষেবার মতো বিবিধ বিষয় নিয়ে। অবসরের পরও এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে গবেষণা বৃত্তি দেয়। এবং সেই গবেষণার জন্য তিনি বহু সময় কাটাতেন গ্রন্থাগারে পড়াশোনায়। তাঁর বয়স যখন ৩৮ সেই সময় থেকেই দৃষ্টিশক্তির সমস্যা শুরু হয়। কম দেখতে থাকেন। সেটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। নিরাময়ের বাইরে চলে যায়। তা নিয়েও তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইন্ডিয়ান হিস্টরি জার্নাল প্রভৃতিতে কিছু নিবন্ধ ছাপান। তাঁর এই লেখাগুলোর বেশিরভাগই ছিল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা, পুরো দস্তুর গবেষণাপত্র নয়।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও শেষের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন মা বেলাবাসিনীর লেখা পুনর্লিখনে। মায়ের প্রথাগত কোনো শিক্ষা ছিল না। তবুও তিনি হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা রপ্ত করেছিলেন। এবং ঋক্‌বেদে উল্লিখিত শ্লোকের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্মত অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। অজানা তাঁর পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞানের সাহায্যে মায়ের লেখাগুলোকে ঘষামাজা করে আরও নিখুঁত করেছিলেন। তাঁরই উদ্‌যোগে ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেই বই 'ঋক্‌বেদ ও নক্ষত্র'। নিজের প্রচুর অবদান থাকা সত্ত্বেও অজানা সম্পাদক/সংশোধক হিসাবেই মাত্র নিজের নাম উল্লেখ করেছিলেন।

অনেকেরই জানা নেই যে অজানা ছদ্মনামে কবিতা ও ছোট গল্প লিখতেন। ১৯৭৩-৭৪ সাল নাগাদ তারই কিছু প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় পত্রিকায়।

বি ই কলেজে পড়ার সময়েই আলাপ হয়েছিল প্রণবকুমার চৌধুরির সঙ্গে। সেই ইঞ্জিনিয়ার প্রণববাবুকেই পরে বিয়ে করেন অজানা, ১৯৬৪ সালে। চাকরি, পড়াশোনা, গবেষণা– সব কিছুর পাশাপাশি সন্তানের লেখাপড়া এবং বেড়ে ওঠার দিকেও তাঁর সমান নজর ছিল। পরে স্বেচ্ছায় নাতিকেও বিজ্ঞান পড়ানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। পড়ানোর ফাঁকেই নাতিকে বলতেন নিজের জীবনের কথা। ১৯৪০ ও ৫০-এর দশকের কলকাতার সেই সব অশান্ত দিনের কথা।

বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য– সব বিষয়েই তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। পড়তে পড়তে রাত কাবার করে দিয়ে ভোরবেলা ঘুমিয়েছেন, এমনটি হরদমই হয়েছে। নিজের বিশাল বইয়ের সংগ্রহও ছিল। ২০১১ সালে মারা যান স্বামী। তারপর নিজেকে আরও বেশি পড়ার মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। আত্মপ্রচার বিমুখ, নীরব জ্ঞানতপস্বী অজানাকে আকস্মিক আঘাত হানে হৃদরোগ। ১৬ জানুয়ারি ২০১৪। ৮৩তম জন্মদিনের ১৪ দিন আগে প্রয়াত হলেন অজানা চৌধুরি।

উমা

উৎস মানুষঙ্ক গ্রাহক হবার নিয়ম

বছরে ৪টি বেরোয়, ৩ মাস অন্তর। চাঁদা বছরে ১০০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। UBI-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে UBI কলেজ স্ট্রীট শাখায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

United Bank of India, College Street Branch,Kolkata- 700073. UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838.IFSC NO.UTBI0COLI08

ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা (পিনকোড ও ফোন নং সহ) এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। বইমেলার স্টলে গ্রাহক করা হয়। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা হয়। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

বিধিসম্মত ঘোষণা

১। প্রকাশস্থানঙ্ক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪

২। প্রকাশকালঙ্ক ত্রৈমাসিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রকঙ্ক বরুণ ভট্টাচার্য

৪। মুদ্রণস্থানঙ্ক জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন। কলকাতা-৭০০ ০০৬।

৫। সম্পাদকঙ্ক সমীরকুমার ঘোষ, ৫২/৫১, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০ ০৩৬।

আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ এপ্রিল, ২০১৪ **বরুণ ভট্টাচার্য**
প্রকাশক

ঠিক স্মৃতিচারণ নয়

আহা, যদি কিছু শিখতে পারতাম!

বরুণ ভট্টাচার্য

নিঃশব্দে চলে গেলেন অজানা চৌধুরি। উৎস মানুষের অভিভাবিকা, পরামর্শদাত্রী, বন্ধু, পাঠিকা, লেখিকা। পেশায় আবহাওয়া বিজ্ঞানী হলেও নানান বিষয়ে অগাধ পড়াশোনা। বই নিয়েই কাটত অবসর জীবন। সঙ্গে ছিল অনিয়মিত লেখালিখি। উৎস মানুষের শৈশবকালে (১৯৮৪-৮৫) পূবণ রায়ের (ওঁর অকালমৃত দাদার নাম) নামে ওঁর কিছু লেখা বেরোয়। পুরনো পাঠকদের হয়ত মনে পড়বে গাইঘাটায় প্রলয়ঙ্কর টর্নেডোর কথা। তা নিয়ে অজানাদির দুর্দান্ত প্রতিবেদনধর্মী লেখাটি পড়ে অনেকেই ঝড়ের সঙ্গে কুসংস্কারকে মেলানোর খেলাটা ধরে ফেলেন। মূলত সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। পূবণ রায় যে অজানাদিই তা অনেক পরে জেনেছি। বিদূষী মায়ের মেয়ে অজানাদি স্বদেশী আবহে বড় হয়েছেন। ওঁর মুখেই শুনেছি, অল্পবয়সে লাঠিখেলা, ছোরাখেলাও শেখেন। ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় কীভাবে দাঙ্গাপীড়িতদের ত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, মুসলমান বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে দাঙ্গাবিরোধী প্রচার করেছেন, এসব যখন বলতেন, মনে হত চোখের সামনে সেই দিনগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। বারবার বলেছি, এসব ইতিহাস লিখে রাখুন ভবিষ্যতের দলিল হবে। বলতেন শরীরটা একটু ভাল হলেই লিখব। ভেবো না, উৎস মানুষকেই সে দেবখন। বুড়ো বয়সে বেদ পড়ার জন্য সংস্কৃত শেখা, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে ছুটতেন। এভাবেই তুলে আনেন অমূল্যরতন! রাধানাথ শিকদার বাঙালির চর্চার বিষয় হয়ে যায় অজানা চৌধুরির হাত ধরে। আমাদের চোখ খুলে দেন। তাহলে শুধু এভারেস্ট মাপাটাই বিজ্ঞানী গণিতজ্ঞ রাধানাথের একমাত্র কাজ নয়! ২০০৯ নভেম্বর সংখ্যার 'লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি' শিরোনামে রাধানাথকে নিয়ে লেখাটি এক দুর্লভ প্রাপ্তি। কথা দিয়েছিলেন ছোটদের উপযোগী করে আবহাওয়া বিজ্ঞানের ইতিহাস লিখবেন। শরীর চলছিল না, দৃষ্টি ঝাপসা, লাইব্রেরি যাওয়া বন্ধ— তাঁকে আর কাজ শেষ করার অবসর দিল না। ফোন করলে বলতেন, যে উৎস মানুষ পাঠাও, দাম তো দেওয়া হল না। খুচরোর সমস্যার কথা তুলে বলতাম ১০০ টাকা হোক তখন নিয়ে নেব। হো হো করে হাসতেন। প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের দিয়ে পেশাগত কৌশল, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা লিখিয়ে নিয়ে তা উৎস মানুষে ছাপতে বলতেন— সম্পাদনা না করেই। জেলেরা বিজ্ঞান না পড়েও নদীর কোথায় মাছ পাওয়া যাবে কীভাবে বোঝেন, কৃষক কীভাবে বীজ বপন করেন, মাটি চেনেন, ঝড়ের সঙ্কেত পান— এসব কথা তাঁদেরই ভাষায় লিখিয়ে নিতে বলতেন। আমরা পারি নি। অজানাদির মতো মানুষ আমাদের সমাজে হাতেগোনা। বয়সের ভার এঁদের মেধাচর্চায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। এমন নীরবে কাজ করে যাওয়া গুণী মানুষের খোঁজ কজন রাখি! অজানাদিদের বুঝতে গেলে কিছুটা শিক্ষিত হওয়া দরকার, সেখানেও আমরা পিছিয়ে। অজানা চৌধুরিরা বিদ্যে জাহির করেন না বা বিদ্যের ঠিকেদারিও করেন না। বলা ভাল, সে সবের পরোয়াও করেন না। ভেতরের তাগিদ থেকে কাজ করে যান। আমরা, যাঁরা ছোটখাটো পত্রিকা প্রকাশ করি, এমন মানুষের খোঁজ পেলে মহামূল্যবান লেখা পাঠকদের সামনে হাজির করি। উৎস মানুষের টিকে থাকাটা দরকার, বারবার বলতেন। আফসোস হয়, যতটা লেখার কথা তার ছিটেফোঁটাও লেখেন নি। তাও যেটুকু পেয়েছি, তাতেই পত্রিকার সম্মান বেড়েছে বলে মনে করি। খুব ভালো হত যদি নতজানু হয়ে অজানাদির কাছ থেকে কিছু শিখতে পারতাম। অজানাদিরা প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে থাকা মানুষ। এঁদের এক এক করে চলে যাওয়া মানে মূল্যবোধের গলায় ফাঁসের দড়ি একটু শক্ত করে বাঁধা। তাই ভয় হয়, ঘাবড়ে যাই, মূল্যবোধের ফাঁসির দিন ঘনিয়ে এল বলে! প্রচারের আড়ালেই থেকে গেলেন এঁরা। এইভাবে আমরা কত মহামূল্যবান সব বিষয়-ভাবনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, তার ইয়ত্তা নেই। এতে কারো কিছু যায় আসে না। এসব বুড়োহাবড়ার দিন শেষ হয়ে এসেছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। বেজায় মূর্খ আমরা, এতে কোনও ভুল নেই। শুধু বুলিসর্বস্ব মানুষের ধারাবাহিক বকবকানি শোনাটাই যেন সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়ত সে কারণেই এখনকার সমাজে অজানা চৌধুরিরা বেমানান!

উমা

গণবিজ্ঞান আন্দোলন আজ ও আগামীকাল

তুষার চক্রবর্তী

প্রথমেই খোলসা করে বলে রাখা ভাল যে কোনো ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা নয়, গণবিজ্ঞান আন্দোলন নিয়ে এই আলোচনার লক্ষ্য, বর্তমান আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের চেহারা কেমন হওয়া উচিত, এই আন্দোলনের কর্মসূচী বা করণীয় কাজ কী কী হওয়া উচিত এসব নিয়ে খোলামেলা ভাববিনিময়— দরকার হলে তর্কবিতর্ক শুরু করা। তবে আজ ও আগামীকালের দিকে তাকাবার আগে খুব বিস্তারিত ভাবে না হলেও, একপলক অতীতের দিকে চোখ বুলিয়ে নেওয়ারও প্রয়োজন। উচিত এই রাজ্যে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রারম্ভবিন্দু বা মূল উৎসটুকু চিনে নেওয়ারও। কেননা সেখানে এই আন্দোলনের যে পরিচয়, তাকে অস্বীকার করলে সেটা অতি অবশ্যই গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষতি করবে। আবার উল্টোদিকে সেই পরিচয় স্বীকার করার মানে এই নয় যে, সেই পরিচয়টাকে একটা খাঁচা বানিয়ে তার মধ্যে আজীবন বাস করতে হবে। যে কোনো মহান লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলটাও মেনে নেওয়া চাই।

পশ্চিমবাংলার গণবিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে উঠেছিল বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষে, আশির দশকের গোড়ায়। সত্তর দশকের রাজনীতির উত্তাল ঝড় তখন অবদমিত ও স্তিমিত হয়ে আসছে। বলপূর্বক ক্ষমতা দখল ও তাৎক্ষণিক সমাজ পরিবর্তনের জন্য সমাজের জমি যে প্রস্তুত নয় সেই অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়েছেন অনেকেই। সমাজের জমি তৈরির জন্য, সমাজকে চেনা ও বদলাবার জন্য বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ ও বিজ্ঞানমনস্কতার শীলন কর্ষণের প্রয়োজনীয়তার বোধ থেকেই গণবিজ্ঞান আন্দোলন জন্ম নিল। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার রাজনীতি, গ্রামের সমাজ পরিবেশের সঙ্গে স্বপ্ন দেখা সাহসী তারুণ্যশক্তির যে পরিচয় ঘটিয়ে ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন ধাক্কা খেলেও সেটাই হয়ে উঠল একাংশের কাছে সমাজকে চিনবার ও আরো মৌলিকভাবে বদলাবার অনুপ্রেরণা। এক কথায় সেটাই ছিল সে সময়ে এই আন্দোলনের মুখ্য প্রণোদনা। আবার বহু নতুন নতুন কর্মী ও সমমনস্ক মানুষজনও আন্দোলনে শুরু থেকেই যুক্ত হয়েছিলেন। এই গণবিজ্ঞান আন্দোলনের নতুন মুখপত্র হিসেবে একদিকে যেমন উঠে এসেছিল অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত উৎস মানুষ, তেমনি অন্যদিকে এতে যুক্ত হয়েছিল ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত মানবমনের মতো পত্রিকা— যা এই ধরনের কাজ আগে থেকেই করে আসছিল। আমার বলতে কোনো কুণ্ঠা নেই যে, এই আন্দোলনের সমালোচনার পাশাপাশি ইতিবাচক সৃজনশীল ও গঠনমূলক দিকেরও কোনো অভাব ছিল না।

পুরনো ও নতুন বহু ধরনের কুসংস্কার দূর করা, ভারতের বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করা, বিজ্ঞান ও সমাজের উন্নতি বিষয়ক সবরকম সমস্যার আলোচনা মানবিক মূল্যবোধের বিস্তার, এই সমস্ত দিক এই ও উৎসমানুষ সহ অন্যান্য গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত পত্রপত্রিকা এবং প্রকাশনায় নিয়মিতভাবে স্থান পেতে থাকে। এদের প্রচার মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এদের ঘিরে গড়ে ওঠে ছোট ছোট স্থানীয় পাঠচক্র ও অনুশীলনী চক্র। পরমাণু অস্ত্র বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয় পরমাণু-শক্তির বিরোধিতার আওয়াজ। সেটা ছিল এই আন্দোলনের প্রসারিত হবার সময়। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও নব্বই-এর দশকে এই আন্দোলনে এল ভাটার টান। কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আছেঞ্জ এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙ্গে যায়, এই ক্ষোভ। কিন্তু গণবিজ্ঞানে আন্দোলনের বেগ স্তিমিত হবার কারণ সম্ভবত ছিল বহুতর। এই আন্দোলনের একটা বড় অংশকে নানা কায়দায় আত্মীকৃত বা কুক্ষিগত করে নেয় তখন এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন প্রধান রাজনৈতিক দল। সেই অতি বৃহৎ বিজ্ঞানের মঞ্চ যত বাড়তে থাকে তত তা দুর্নীতির পাঁকে কালিমালিপ্ত করে আন্দোলনকে। একদল আমলা-প্রতিষ্ঠান-রাজনীতি-দুর্নীতির রমরমায় আড়ালে চলে যায় গণবিজ্ঞান আন্দোলনের মূলধারা ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা। উৎস মানুষ সহ এই আন্দোলনের বার্তাবহ মুখপত্ররা অনেকেই তা থেকে গা বাঁচিয়ে নিজেদের অগ্নিশুদ্ধ অস্তিত্ব বজায় রেখেছে বটে, তবে তাদের প্রচার সংখ্যা ও প্রভাব কমে গেছে অনেকখানি।

কিন্তু গণবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রয়োজন যে আজকের দিনেও ফুরিয়ে যায় নি তা দিন দিন টের পাচ্ছেন আন্দোলনের কর্মীরা। এবং করণীয় কী সেই প্রশ্ন অহরহ উঠছে। অর্থবল বা পত্রিকা প্রকাশের পরিকাঠামোর অভাবকে ছাপিয়ে উঠছে প্রাসঙ্গিকতার সমস্যা। কেন না, আমরা বাস করছি এক নতুন আর্থসামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে। সবচেয়ে বড় কথা হল এই আন্দোলনকে আবার দুর্বার ও গতিময় করে তুলতে গেলে কি কি করা দরকার সেই প্রশ্নটা আজ আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠছে। আন্দোলন যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি সেটা নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছে মহারাষ্ট্রে ডাঃ নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকরের হত্যা। একুশ শতকের উচ্চপ্রযুক্তির ভারতেও কুসংস্কার যে আপনা হতে ধ্বসে যাবে এমন নয়, বরং তা আরো মরিয়া হয়ে আঘাত করতে প্রস্তুত। আরো অনেক কিছুর মতো এই ঘটনাও নতুন করে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। যা আমাদের রাজ্যেও এই আন্দোলনের কর্মীদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ এনে দিয়েছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে আরব্ধ বহু কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার গুরুদায়িত্ব।

সত্তর দশকের পর ভারতীয় রাজনীতি ক্রমশ যে আরো বেশি করে নির্বাচনী রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে এটা যেমন সত্যি, তেমনি সামাজিক সমস্যা ও কুসংস্কারের বোঝা এতটুকু হাল্কা হয় নি। সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত, পুরুষ-আধিপত্য, নিয়তিবাদী আত্মসমর্পণের মনোভাব, অলৌকিকতায় বিশ্বাস, অন্ধভক্তি দিনে দিনে বেড়ে উঠছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেমন এসব মিশে আছে তেমনি রাজনীতির অঙ্গনেও তা প্রবল পরাক্রমে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। নতুন বাজার অর্থনীতি ও মার্কিনি সংস্কৃতির অবাধ আমদানি ও আগ্রাসন সনাতনী ভারতীয় এইসব সামাজিক কুসংস্কারকে তাড়ানো দূরস্থান বরং চুটিয়ে ব্যবহার করছে। দূরদর্শন, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বহন করছে তার দগদগে উদাহরণ। খাপ, অনার কিলিং, ডাইনি হত্যা বেড়েছে বৈ, কমে নি। অথচ ১৯৫৮ সালে জওহরলাল নেহরুর সাধের বিজ্ঞান নীতি বিষয়ক ঘোষণার বিজ্ঞান মনস্কতা প্রচার ও প্রসারের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে তাঁর কন্যা ইনিদরা সংবিধানে রাষ্ট্র ও নাগরিকের কর্তব্যের তালিকায় জুড়ে দিয়েছেন। কথা ও কাজের ফারাকটাই যেন ভারতীয় রাষ্ট্র ও সংবিধানের বৈশিষ্ট্য। সবটাই লোকদেখানো ব্যাপার।

সত্তর দশকের পর ভারতীয় রাজনীতি ক্রমশ যে আরো বেশি করে নির্বাচনী রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে এটা যেমন সত্যি, তেমনি সামাজিক সমস্যা ও কুসংস্কারের বোঝা এতটুকু হাল্কা হয় নি। সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত, পুরুষ-আধিপত্য, নিয়তিবাদী আত্মসমর্পণের মনোভাব, অলৌকিকতায় বিশ্বাস, অন্ধভক্তি দিনে দিনে বেড়ে উঠছে।

অথচ লেগে থাকলে যে রাষ্ট্রকে দিয়ে তার অপছন্দের কাজটাও করিয়ে নেওয়া যায় তার বেশ কিছু উদাহরণ এই টালমাটাল সময়ে পাওয়া গেছে। যেমন, এই ঢালাও বেসরকারিকরণের যুগেও এসেছে শিক্ষার অধিকারের আইন, তথ্যের অধিকারের আইন। নির্বাচন পরিচালনার অধিকার সরকারের ও প্রশাসনের হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। লোকপাল বিল নিয়ে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে, এর মধ্যে শিক্ষার অধিকার আইন তৈরির জন্য যিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি ছিলেন সর্বভারতীয় গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একজন সংগঠক। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের চাই এই ধরনের মানুষ, যাঁরা শিক্ষিত, জনদরদী, দেশপ্রেমী। ম্যারাথন রানারের মতো ধৈর্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন একটি উদ্দেশ্যে যাঁরা কাজ করতে পছন্দ করেন। আমাদের দেশে এমন মানুষ নেই এমন নয়। তাঁদের চিনতে হবে এবং তাঁদের সঙ্গে গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে যুক্ত করতে হবে। নরেন্দ্র দাভোলকর কুসংস্কার ও কালজাদু দিয়ে মানুষকে প্রতারণা করার অপরাধীদের সহজে সনাক্ত করা ও শাস্তি দেবার আইনটি গোটা দেশে— কেন্দ্র, রাজ্য এবং জেলা স্তরে চালু করার বিষয়টিও শিক্ষার অধিকার, তথ্যের অধিকারের মতো একটি সর্বজনীন অধিকার হিসেবে চালু করার কাজটা গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এটা পশ্চিমের সেকুলার ভাবধারা আমদানি করার দাবি নয়, এটা সামাজিক অত্যাচারের একটি ধরন যা সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের ওপর বেশি করে চাপে— তাকে আটকাবার আইন। অত্যন্ত সাবধানে লোকসংস্কৃতি এবং ধর্মবিশ্বাস থেকে বিযুক্ত করে এই জাতীয় নিছক প্রতারণা ও অত্যাচারকে তাড়াতে হবে। বহুক্ষেত্রে এই ধরনের কাজে যুক্ত ওঝা, হাতুড়ে চিকিৎসক ও কিছু চালাক সুযোগসন্ধানীদের বিকল্প কাজে যুক্ত করার দায়িত্ব নিতে হতে পারে। আর, কর্পোরেটদের যে প্রতারণা ও অন্ধবিশ্বাসের ব্যবহার, ছদ্ম-বিজ্ঞানের ব্যবহার সেই কাজের ধরন, প্রকরণ ও পরিসর হবে ভিন্ন। শহরের নাগরিক আন্দোলনের মধ্যে কেন্দ্রীয় আইন কাজে লাগিয়ে কর্পোরেট বিরোধিতার আন্দোলনের পাশাপাশি এদের চালাতে হবে।

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সামনে আরেকটি বিস্তৃত পরিসর

হাজির করেছে পরিবেশ সমস্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। শুধু বৃক্ষরোপণ বা প্লাস্টিক বর্জন নয় (যদিও এ দুটি সরকারি কাজ যা চালিয়ে যেতে হবে)— জল, জমি জঙ্গল সহ অন্যান্য সারিতে তাদের থাকতে হবে। এই কাজ সাহসিকতা দাবি করে। সক্রিয়ভাবে এসব কাজ করতে গেলে উন্নয়নের নামে প্রোমোটার, ব্যবসায়ী ও লগ্নিকারকদের রোষের শিকার হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। কিন্তু বহু মানুষ একাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসছেন। কেউ কেউ খুন হয়ে যাচ্ছেন। যেমন, ডানকুনিতে জলাভূমি রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়ে গেলেন তপন দত্ত। গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে এই ধরনের ব্যাপারে দ্রুত অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। কোনো একটি সংগঠন নয়, ছোট ছোট বহু সংগঠনের নেটওয়ার্ক হিসেবে ছড়িয়ে না পড়লে, কোনো একটি সংগঠনের পক্ষে এ কাজ করে ওঠা সম্ভব নয়। এই কাজটা বলতে গেলে এখনো প্রায় অধরা রয়ে গেছে। রাজনীতি এ রাজ্যে এই কাজে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে। বামপন্থার নামে বাজার উন্নয়নের নিও-লিবারেল চিন্তাকে আশ্রয় করায় পরিবেশ আন্দোলন ঝুলনযাত্রার মতো পোশাকি রূপ নিয়েছিল আর অন্যদিকে ছিল পেশিশক্তির হুমকি। অথচ, এখনো আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে বস্তুতান্ত্রিক সচেতনতা। আজকের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এ কাজে না লাগালে আমরা কিন্তু ভুল করব। দুঃখের কথা আগের আমলের মতো এই সুযোগটা আজও যেন ক্রমশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

শুধু বিরোধিতা ও প্রতিবাদ নয়— জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, নতুন পরিবেশবান্ধব কৃষি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের কাজ, এদের সঙ্গে গণবিজ্ঞান যুক্ত হয়ে নির্মাণের কাজে হাত লাগাবে এটাই কাম্য। এই নির্মাণের কাজে যে মানসিকতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার প্রয়োজন তা গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে সুস্থায়ী হয়ে ওঠার পথ দেখাতে পারে। নির্মাণের কাজে যুক্ত হবার মানে এই নয় যে, প্রতিবাদ ও রাজনৈতিক সচেতনতাকে ছাঁটাই করতে হবে। যাঁরা বিকল্প নির্মাণের কাজ সার্থকতার ও নিষ্ঠা সহ করে চলেছেন, তাদের কারো কারো সঙ্গে যুক্ত থাকার সূত্রে এটা বলতে পারি যে, রাজনৈতিক সচেতনতার গুরুত্ব এ সব কাজে সবার আগে ধরা পড়ে। সংসদীয় ভোটে জেতার রাজনীতি নয়— দেশ ও দুনিয়ার হালচাল বোঝবার ক্ষমতা, কাজের দিশা বুঝতে পারার ক্ষমতা, যৌথ ভূমিকায় নামবার দক্ষতা। আমি যে রাজনীতির কথা বলছি সেই রাজনীতি বিহনে এরা অধরা থেকে যায়।

এই রাজনীতি বুঝতে পারলে বোঝা যাবে যে, আজকের ভারতীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সবচাইতে বড় বিপদ ঘনিয়ে এসেছে কৃষি ও খাদ্য-বাণিজ্যকে কুক্ষিগত করার প্রয়াস ও পরমাণুবিদ্যুৎ-এর নামে একটি বিপজ্জনক ও কেন্দ্রীয় শক্তি উৎপাদনের চাপাবার নীতি। মার্কিন-ভারত কৃষিবিজ্ঞান চুক্তি ও পরমাণু চুক্তি সারাৎসার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুলিশ হিসেবে কাজে লাগিয়ে যে অতি বৃহৎ কর্পোরেট লগ্নিকারকরা এখন দুনিয়াকে নিজেদের অর্থনৈরিক লাভের অবাধক্ষেত্রে পরিণত করতে উদ্যত সেই গিলোটিনে চাপানো হয়েছে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসকশ্রেণী। ভারতের যাবতীয় প্রাকৃতি সম্পদ এদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে এবং সংবাদমাধ্যম এদের হাতের পুতুল। পরিকল্পিতভাবে ভারতের কৃষি ও গ্রাম থেকে কোটি কোটি মানুষকে বাস্তুহীন করা হয়েছে। খনিজ সম্পদ দখলের জন্য জঙ্গল থেকে উৎখাত করা হচ্ছে আদিবাসী মানুষদের। গোটা কাজটাই করা হচ্ছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-উন্নয়নের যুক্তিতে। এর বিরুদ্ধে তৃণমূল স্তরে যে সব আন্দোলন সারা ভারতে গড়ে উঠেছে, আজকের গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে তারা পাশে পেতে চায়। আগ্রাসনের এই দুটি ছক ভেঙে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। এই ছক ভাঙার লড়াই দীর্ঘদিন ধরে চালাতে হবে। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অন্য যে সব পরিসরের কথা এর আগে উল্লেখ করেছি তার কোনোটাই এই যুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উন্নয়নের নামে যে পথে আমরা চলেছি সেই পথে কোথায় ভুল, গত ছয় দশকে বিশেষত গত তিন দশকে উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও, ভোগ্যপণ্যের বাজারের অবাধ প্রসার সত্ত্বেও, আর্থিক অসাম্য কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষের ও দেশের নিরাপত্তা কীভাবে দিনে দিনে কমেছে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কাজ তা মানুষকে বুঝিয়ে বলা। যে পথে দেশকে এখন গড়ে-পিটে তৈরি করা হচ্ছে তার বিশ্লেষণে সুসঙ্গত ও সুসংহত প্রশ্ন তোলাটাই আজকের গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একনম্বর কাজ। মস্ত কাজ।

সবশেষে আরেকটা কথা না বললে নয়। স্বদেশসেবক হিসেবে কর্তব্য পালনে শুধু সংসদীয় রাজনীতি নয়, আমাদের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রায় সবকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান যে ব্যর্থ হয়েছে তা প্রমাণ করেছে জিন বদলানো জি এম শস্য ও পরমাণু বিদ্যুৎ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানগত স্তরে বিজ্ঞানীদের অবস্থান। ব্যক্তি হিসেবে যদিও অনেক বিজ্ঞানী এর প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজ্ঞানকে এই ধরনের ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা করবার কাজটাও করতে পারে গণবিজ্ঞান। তাই কুসংস্কার ও অপবিজ্ঞানের পাশাপাশি কর্পোরেট ও রাষ্ট্রলালিত জনবিরোধী তথা দেশবিরোধী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরুদ্ধেও গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে সোচ্চার হতে হবে।

উমা

রবীন্দ্রগানে বিজ্ঞান

আশীষ লাহিড়ী

জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের দ্বৈত-চরিত্র সম্বন্ধে ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, তার মধ্যেই বোধহয় বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সারাৎসার ধরে দেওয়া আছে। 'আমাদের দুজনের টান যেমন অনুভব করতাম, তেমনি তফাৎটাও বুঝতাম... আমার নিজের যে-মনোরূপময় জগৎ সেটা এই কারণে মূল্যবান নয় যে তার যুক্তিগত সম্ভাব্যতা ষোলো আনা, তা আনন্দ জোগায় বলেই আমার কাছে মূল্যবান।'[১] কিন্তু তার পরের বাক্যেই যোগ করেন, 'তা সত্ত্বেও আমার ধারণা আমার স্বভাবের একটা অংশ যুক্তিনিষ্ঠ, তা প্রমাণিত তথ্য নিয়ে খেলনা বানিয়েই ক্ষান্ত হয় না, **বিষয়গত (অবজেকটিভ) বাস্তবতার বিশ্লেষণজাত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আনন্দ খোঁজে**।'[২] এ এক অনবদ্য আত্মবীক্ষণ। বিজ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষা ও যুক্তিযোগে প্রমাণিত তথ্যকে নিয়ে খেলনা— 'playthings'— বানানো তাঁর স্বভাব, এবং সে-স্বভাবের অন্তত একটা অংশ আবার 'logical'— অবজেকটিভ বাস্তবতার যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ থেকে আনন্দ নিংড়ে নেওয়া তাঁর স্বভাবধর্ম— সেই আনন্দ, অন্ধ 'সুখের খেলা' থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে তবে যা পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনা সম্বন্ধে পরিমল গোস্বামী বলেছিলেন ঃ ''যখন তিনি বলেন, 'জড় হইতে মনুষ্য-আত্মার অভিব্যক্তি; মধ্যে কত কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধান' (নিষ্ফল আত্মা, ১৮৮৫) তখন মনে হবে তিনি বস্তুবাদী। মনে হলে ভুল হবে না, যদিও প্রচলিত অর্থে তিনি বস্তুবাদী নন। তিনি প্রচলিত অর্থে ভাববাদী নন, অথচ তিনি ভাববাদী। **কোনো একটিমাত্র সংজ্ঞা দিয়ে তাঁকে জানা যাবে না, কেননা তাঁর মনে সম্ভবতঃ স্পেশালাইজেশনের কোনো স্থান ছিল না**। মূলতঃ তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, এবং তাঁর চিন্তাধারা যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মত, এবং তাঁর যুক্তির শেষ লক্ষ্য সৃষ্টির আনন্দে অবগাহন— তা সে বিশ্বসৃষ্টির বিস্ময়জনিত আনন্দেই হোক, বা আপন সৃষ্টির আনন্দেই হোক।''[৩]

এটাকে স্ববিরোধিতা মনে হতেই পারে। কিন্তু হয়তো এটা আসলে শিল্পীর সৃজনী সত্তার দহন। শিল্পীর অহংকার নিয়ে তিনি কখনো এ-ঘাটে, কখনো ও-ঘাটে খেয়া বেঁধেছেন, কিন্তু নোঙর ফেলেননি কোথাও। এই অহংকারপটেই দর্শন, বিজ্ঞান আর সৃজনশীলতাকে একাকার করে নয়, কিন্তু পাশাপাশি রাখতে চেয়েছিলেন তিনি, পেরেওছিলেন। সংস্কৃতির অখণ্ডতা ঐভাবেই গড়ে নিয়েছিলেন।

হয়তো সারা জীবন ধরে সীমা আর অসীমের দ্বন্দ্ব নাম দিয়ে তিনি এই একটাই দ্বন্দ্ব, একটাই স্বাদের কথা নানা সুরে, নানা রঙে, নানা ছন্দে প্রকাশ করে গেছেন। অনন্ত এ দেশকালে, মহাবিশ্বে, মহাকাশে আমি মানব *একাকী* ভ্রমণ করে চলেছি *বিস্ময়ে*! কী অমোঘ ঐ 'বিস্ময়' কথাটির প্রয়োগ! কী অকল্পনীয়, অথচ কী সত্য এই ঘটনাটা! কেননা তামাম মহাবিশ্বে মানুষ ছাড়া আর কার কাছে চৈতন্য নামক ঐ আশ্চর্য পদার্থটি, যার বলে সে নিজেকে নিয়ে ভাবতে পারে, এবং ভেবে কুলকিনারা না পেয়ে 'বিস্ময়' বোধ করতে পারে? এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে আরেকটি বিস্ময়ের কথা। 'আকাশভরা সূর্যতারা' গান সম্বন্ধে ১৯৬১ সালে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য যা লিখেছিলেন তা বিশেষভাবে মনে ছাপ ফেলে যায়ঃ '**মহাকাশের অচিন্তনীয় বিশালতার দিকে চেয়ে এই যে বিস্ময়, তা ঋগ্বেদের ঋষি-কবির বিস্ময়বোধ নয়। এ বিস্ময় নিউটন থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিপুল রহস্যোদ্ঘাটনের ইতিবৃত্তের সঙ্গে পরিচিত এক আধুনিক মনের বিস্ময়-চেতনা**।'[৪] রবীন্দ্রনাথের গান ও বিজ্ঞান বিষয়ে স্বর্ণকমলের আরো বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ খুবই মূল্যবান। 'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে ভরা আমার অঙ্গ' গানের 'দ্বিতীয় লাইনে এসে আমরা থমকে দাঁড়াই— ''**তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ,/ও তার অন্ত নাই গো নাই**।'' উনিশ শতকের আগে মানুষের জানাই ছিল না যে, নিখিল বস্তু-ব্রহ্মাণ্ড গঠিত যে-উপাদানে সেই একই উপাদানে গঠিত জীবদেহও।'[৫] প্রথম লাইনের ঔপনিষদিক আনন্দ-উপলব্ধির সঙ্গে এইভাবে নিটোলভাবে মিলে যায় আধুনিক বিজ্ঞানের সত্য। এই একই জাদুর খেলা '**তাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে**' পঙ্‌ক্তিতেও। 'তারায় তারায় দীপ্ত শিখায়' গানটির বিশ্লেষণেও এক নতুন মাত্রা আনেন স্বর্ণকমল। আলোক-মাতাল স্বর্গসভার

'আদি-যজ্ঞশালায়' নিমন্ত্রণ পেয়েও কবির মন 'রইল না'। 'গানখানির প্রথমাংশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী শেষাংশে জীববিজ্ঞানী। কোটি বছরের মহাসাগর পার হয়ে যেখানে এসে পৌঁছানো গেল সেই চলন্ত পৃথিবীর বুকে কালক্রমে একদিন— ''**হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে/শ্যামল মাটির ধরাতলে...**''।[৬]

আরো সত্য, আরো কাব্যময় এবং আরো অমোঘ হল 'বিদ্রোহী পরমাণু'র রূপকল্প, যা খুব স্বাভাবিকভাবে মিশে যায় নটরাজের পৌরাণিক রূপকল্পের সঙ্গে...

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে।।(১৯২৭)

পরমাণু যে সদাই নেচে চলেছে, অথচ সাদা চোখে অদৃশ্য, এই বিস্ময়টা রবীন্দ্রনাথ বারে বারে প্রকাশ করেছেন। সে-নৃত্যকে তিনি 'বিদ্রোহ' বলে চিহ্নিত করেন এই কারণে যে তা নিয়ত-অস্থির। স্থিতিশীলতা নয়, নিষ্কম্পতা নয়, বরং বিরামহীন অস্থিরতাই সমস্ত সৃষ্টির মূলেঙ্খ **বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া**। একই কারণে তা সুন্দরও বটে, কেননা তার প্রলয়নাচনেই তো জটার বাঁধন-খসা জাহ্নবী অবশেষে মুক্তধারায় প্রবাহিণী হন।

নটরাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনার মৌলিকতা নিমেষের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায় যখন আমরা নটরাজ-পুরাণকথার চিরাচরিত ব্যাখ্যার সঙ্গে এই ধারণার তুলনা করি। আনন্দ কুমারস্বামী লিখেছেনঙ্খ 'এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই নৃত্যগুলির প্রত্যেকটিরই মূল ভাবটি মোটের ওপর একই— সেই আদিম ছন্দোময় শক্তির বহিঃপ্রকাশ।' এ বক্তব্যের সমর্থনে চিদম্বর মুন্মানি কোভাই-এর নটরাজ-বন্দনা থেকে উদ্ধৃতি দেন তিনিঙ্খ 'হে প্রভু, তোমার হস্তধৃত ডম্বরুই গড়েছে ও সুশৃঙ্খল রূপ দিয়েছে ঐ মহাকাশকে, এই পৃথিবী ও অন্যান্য বিশ্বকে, সংখ্যাতীত আত্মাকে। তোমার উত্তোলিত হস্ত তোমার সৃষ্টির চেতন ও অচেতন উভয় পরম্পরাকেই রক্ষা করে। তোমার অগ্নিধারী হস্ত এই সকল বিশ্বকে রূপান্তরিত করে। ভূমিতে স্থাপিত তোমার পবিত্র পদে স্থান লাভ করে কার্য-কারণ পরম্পরার বোঝায় পীড়িত আত্মাগুলি। আর তোমার উত্তোলিত পদে পরম শান্তি লাভ করে তোমার শরণাগত প্রার্থীরা। হে প্রভু, এই পঞ্চক্রিয়া তোমারই কর্মকাণ্ড।'[৭] কিন্তু যখনই রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী পরমাণুর চিত্রকল্প ব্যবহার করেন, লেখেন, **পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু,** কল্পনা করেন শিবের নৃত্যের ছায়া '**বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে**' কম্পিত হচ্ছে। তখনই কুমারস্বামী কথিত ঐ 'আদিম ছন্দোময় শক্তির বহিঃপ্রকাশ' এক নতুন মাত্রা পেয়ে যায়।

এইভাবে দর্শন আর পুরাণ মিশে যায় তাঁর সৃষ্টিতে, আর সে-প্রক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করে আধুনিক বিজ্ঞান। একে বলা যায় বৈজ্ঞানিক ধারণার কাব্যিক অন্তর্ধারণ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রক্রিয়ার শিরোমণি।

সূত্রনির্দেশঙ্খ

১. Sisir Kumar Das (ed.), 'Jagadis Chandra Bose,' in *The English Writings of Rabindranath Tagore,* Vol. III (New Delhi : Sahitya Akademi, 1996) p. 826.
২. ঐ
৩. পরিমল গোস্বামী, 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান', *রবীন্দ্রায়ণ* দ্বিতীয় খণ্ড (সম্পা পুলিবিহারী সেন), বাক্-সাহিত্য, কলকাতা ১৯৬১, পৃষ্ঠা ১৪৬।
৪. স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিক বিজ্ঞান*, কথারূপ, কলকাতা ২০১১, পৃষ্ঠা ৫৬।
৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৫২।
৬. ঐ পৃষ্ঠা ৫৪।
৭. Ananda K.Coomaraswamy, *The Dance of Shiva: Four teen Indian Essays*, Revised edn., Noonday Press, New York, 1957, pp. 66-78.

উমা

বিদ্যা মন্দির না দেবতার মন্দির

কর্ণাটকের বিদারে হুমানাবাদ তালুকে গোবিন্দ কাণ্ডা গ্রামে প্রাইমারি স্কুল বাড়িটা ভেঙে পড়ছিল। ২০১০-এ গ্রামবাসীরা সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের টাকায় নতুন স্কুল বাড়ি গড়ে তুললেন। নতুন বাড়িতে স্কুল চালু হবার কথা। তা তো হলই না। সেখানে 'শিব মহাদেব মন্দির' আর শ্রী পরমেশ্বর মহারাজের আশ্রম চালু হয়ে গেল। ছাত্র সংখ্যা কম এই যুক্তিতে স্কুলের বাড়িতে মন্দির— এ যুক্তি গ্রামবাসীরা মানতে চাইলেন না। গ্রামে স্কুল থাকাটা জরুরি। মন্দির তো অন্য কোথাও হতেই পারে। গ্রামবাসীরা স্কুল বাড়িতে মন্দির বা আশ্রম হওয়াটা একেবারেই মেনে নিচ্ছেন না। সরকারি আধিকারিকরা দখলদারদের হটিয়ে দিতে চাইছে। মন্দির আশ্রম গড়ার পেছনে নির্দিষ্ট কারণ জানতে চেয়ে নোটিশ জারি করা হয়েছে।

সনাতন বিশ্বাস

জয়দেব গুপ্ত

আত্মা ও জন্মান্তর

তার নাম সনাতন। কিন্তু সে মোটেই সনাতনপন্থী নয়। আবার উগ্র আধুনিকতাও তার না-পসন্দ। সনাতন অনেক কিছুই নিজের মতো করে ভাবে , আমাকে বলে। আমি সে সব লিখে রাখি। অর্থাৎ এখানে আমি যা কিছু লিখছি তার বেশিটাই সনাতন যা আমায় বলেছে, তাই লিখে রাখা। শুধু সনাতন সম্বন্ধে যা লেখার, সেটুকুই আমি লিখেছি। বাকি সমস্তটা সনাতনের কাছ থেকে শোনা।

১

সনাতন উবাচ

রাজা সুবাহন বললেন, 'আপনাদের দ্বারা কিসসু হচ্ছে না।'

—'কেন এমন কথা বলছেন রাজন?'— একজন ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করল।

—'আপনাদের ওপর মানুষের বিশ্বাস ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। আপনাদের যাগযজ্ঞের ওপর মানুষের ভরসা কমছে। ইন্দ্র, অরুণ, বরুণ, অগ্নি— এই সব দেবতার ওপর মানুষের আস্থা কমছে। ব্রাহ্মণদেরও সাধারণ মানুষ এখন বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করে না।'

—'রাজন',— অন্য এক ব্রাহ্মণ বললেন, 'রাজানুগ্রহে আমরা তো নিয়মিত যাগযজ্ঞ করছি। জনসমাগমও হচ্ছে'।

— 'কচু হচ্ছে'। রাজা সুবাহন ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন।

[এ কাহিনীর সময়কাল ৭০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ বা আজ থেকে ২৭০০ বছর আগেকার কথা। তখন বৈদিক যুগের শেষ প্রান্ত। বৈদান্তিক যুগ প্রায় আরম্ভ হচ্ছে।]

এতক্ষণ একজন ব্রাহ্মণ একধারে চুপচাপ বসেছিলেন। তিনি এবার বললেন, 'রাজন, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করার সময় এসেছে'।

—অন্য একজন বয়স্ক ব্রাহ্মণ বলে উঠলেন, 'ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিও কি রাজা সুবাহনের সঙ্গে একমত যে, সাধারণ মানুষ এখন ব্রাহ্মণদের ভক্তিশ্রদ্ধা কম করছে'?

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দেবার আগেই রাজা জবাব দিলেন, 'হাঁ, তাই। বৈদিক রীতিনীতি অনুযায়ী আপনারা বহু শত বছর ধরে শুধু ভস্মে ঘি ঢেলেছেন। ঋকবেদের মন্ত্র উচ্চারণ সহ অনেক ধূম্রজাল উদ্গিরণ করেছেন। ভূমির নানা প্রান্ত ছাইগাদায় পরিণত করেছেন। আর তৎসহ গোবৎসের মাংস সহযোগে রাশি রাশি সোমরস পান করে মাতলামো করেছেন। যুগ যে বদলাচ্ছে, প্রাচীন ধ্যানধারণা যে পাল্টাচ্ছে, মানুষ যে ওই সব লোক দেখানো মতে বিশ্বাস করছে না, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতা যে দিন দিন খর্ব হচ্ছে, আপনাদের মোটা মাথায় তা এখনও ঢোকেনি।

কয়েকজন ব্রাহ্মণ একযোগে বলে উঠলেন, 'তাহলে তো যাগযজ্ঞ আরও বর্ধিত আকারে করতে হবে। রাজন, আপনি যজ্ঞ অনুদান আরো বৃদ্ধি করুন। আমরা বৎসরব্যাপী যজ্ঞ আয়োজন করি।'

উত্তর দিলেন যাজ্ঞবল্ক্য, 'আপনারা শত বৎসরব্যাপী যজ্ঞ করলেও মানুষের বিশ্বাস ফেরাতে পারবেন না। ইন্দ্রাদি দেবতাদের এখনকার মানুষ চোখে দেখেনি। তাঁদের অবয়ব কেমন ছিল, তাও তারা চোখে দেখেনি। একই প্রাচীন পন্থায় আপনারা শত শত বছর ধরে যজ্ঞ করে চলেছেন, তার প্রভাব এখন আর মানুষের মনে স্থান পায় না। কিন্তু গো-বৎসের পলহ ও সোমরস সহযোগে যে মহোৎসব করেন (বা কেলোর কীর্তি করেন), সেগুলো দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আপনাদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা হয়েছে যে, রাজানুগ্রহে রাজকোষ ধ্বংস করে আপনারা ফূর্তি করেন। বেশি যজ্ঞ বা দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ করলে আপনাদের সম্মান আরও খর্ব হবে।'

অন্যান্য ব্রাহ্মণরা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে কী করতে হবে?'

রাজা উত্তর দিলেন, 'প্রথমে ভাবুন, এই সব যাগযজ্ঞ ইত্যাদির জন্য রাজারা অর্থব্যয় করেন কেন?'

'কেন?' জানতে চাইলেন একজন।

'কারণ, যতদিন সাধারণ মানুষ যাগযজ্ঞ, দেবতা, ঈশ্বর, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি নিয়ে মানসিকভাবে ব্যস্ত থাকবে, ততদিন ক্ষত্রিয় রাজারা তাদের শাসন ব্যবস্থা বাধাহীন ভাবে কায়েম রাখতে পারবেন। রাজদণ্ডের প্রতাপ বজায় রাখার জন্য মানুষকে

ভুলিয়ে রাখা প্রয়োজন। আর সেই জন্যই আপনাদের এত কাঁড়ি কাঁড়ি অনুদান দেওয়া হয়। গোদান, ভূমিদান থেকে আপনারাও লাভ পান। রাজারা খোশ মেজাজে রাজত্ব করে যান। একটা কথা মাথায় রাখবেন, রাজন্যবর্গের প্রতাপ অপ্রতিহত রাখার জন্যই আপনাদের কর্মকাণ্ড।

'তার মানে আমরা রাজতন্ত্রের ক্রীড়নক?'

রাজা হু (শালা, এতটুকু পরিশ্রম না করেও তো বেশ আরামে করে খাচ্ছিস, আবার বাতেলা কেন?)

রাজতন্ত্র, ধর্ম, ভূমি এবং গোসম্পদ পরস্পর একই সূত্রে গ্রথিত। ধর্ম হচ্ছে এক ধরনের অস্ত্র, যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বশে রাখা যায়। কিন্তু আপনাদের ক্রিয়াকাণ্ড এখন সেসব কিছুই করতে পারছে না।

বৈদিক যুগের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণরা কোনো গোষ্ঠী ছিল না। বেদ জ্ঞান অর্জন করলে তাঁদের ব্রাহ্মণ বলা হত। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র জ্ঞানার্জনের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান ব্রাহ্মণদের বেশিরভাগেরই সেই জ্ঞান নেই, জ্ঞানার্জনের চেষ্টা নেই। শুধুমাত্র পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ এই সুবাদে তাঁরা বংশ পরম্পরায় ব্রাহ্মণ হয়ে চলেছেন। অথচ বেদজ্ঞান তাঁদের ঠনঠনিয়া। শুধুমাত্র ঋকবেদ মন্ত্র মুখস্থ করে আর ভস্মে ঘি ঢেলে জীবন কাটাচ্ছেন। জ্ঞান বৃদ্ধির ইচ্ছে নেই, নতুন কিছু চিন্তা করার কোনো বাসনা নেই। ব্রাহ্মণ তুমি কী কারো?— আজ্ঞে, আমি যজ্ঞ করি... যজ্ঞ করি, এবং যজ্ঞ করি।

এক ব্রাহ্মণ বললেন, 'সর্বোপরি হচ্ছে ধর্ম। ধর্মের কারণেই সমাজ এবং সমাজের কারণে রাজতন্ত্র। ধর্ম বা সনাতন ধর্ম বা ব্রাহ্মণরা যা বলবেন, ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য তার প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া।

রাজা কয়েক পল ভাবলেন এবং বললেন, 'ধর্ম যেদিন রাজদণ্ডকে বশীভূত করবে, জানবেন সেইদিন হবে পৃথিবীর অন্ধকারময় যুগ। আপনারা রাজানুগ্রহে ধর্মকে লালন করেন, তাই করবেন।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন, এবার কথা বললেন, 'রাজন, ব্রাহ্মণ হয়েও আমি আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। রাজদণ্ড ধর্মকে শাসন করে নিজের স্বার্থে। আমরা ব্রাহ্মণরাও সেইরকম ধর্মকে ব্যবহার করি নিজেদের স্বার্থে। তবে রাজধর্ম, নাকি ধর্ম— কোনটা বড়, সেই আলোচনা এখন বাঞ্ছনীয় নয়। বরং প্রাথমিক যে প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল, সেটাই বেশি প্রয়োজনীয়। হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস নিম্নগামী। আর এজন্য সাধারণ মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এটা সত্য যে, ধর্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের অধোগমন কিছু কিছু কেন, বেশিরভাগ ব্রাহ্মণদের বিলাসবহুল জীবনযাপন, বৈদিক পূর্ণজ্ঞানের অভাব এবং ধর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের অজ্ঞতাই দায়ী। আমি ব্রাহ্মণ, আমিই মানবশ্রেষ্ঠ— এই অহংবোধ অর্বাচীন। চেতনার, বুদ্ধির, কৌশলের উদ্ভাবন প্রয়োজন। যদি অনুমতি দেন তো কিছু বলি—

রাজা বললেন, 'অনুমতি দিলাম, আপনি বিবৃত করুন।'

যাজ্ঞবল্ক্য কিছুক্ষণ নির্বাক রইলেন। সম্ভবত নিজের মনের মধ্যে কথাগুলো সাজিয়ে নিলেন। বললেন, 'আজ থেকে প্রায় সপ্ততি বৎসর পূর্বে আপনার পিতামহ রাজা প্রবাহন কিছু উপায় ভেবেছিলেন। আপনাদের জ্ঞানার্থে জানাই, রাজা প্রবাহন ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও সকল বেদজ্ঞান এবং ব্রাহ্মণদের সমস্ত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর কাছে এমনকি অনেক নবীন ব্রাহ্মণও শিক্ষার্জনের জন্য আসত। রাজা প্রবাহন বুঝেছিলেন, এই যাগযজ্ঞ, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদির বন্দনা মানুষ বেশিদিন বিশ্বাস করবে না। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রর আমলে যা হত, বর্তমান মানুষের মধ্যে এইসবের প্রতি সন্দেহ দানা বেঁধেছে। তাই তিনি নতুন উপায় ভাবতে শুরু করেছিলেন। এই অবধি বলে যাজ্ঞবল্ক্য রাজার দিকে তাকালেন।

রাজা সুবাহন বললেন, 'আমার পিতামহের নতুন চিন্তাধারা সম্পর্কে আমিও কিছুটা অবগত আছি। আপনি যা জানেন এবং আমি যতটুকু জানি, এই দুই মিলিত করে আমরা তাঁর ভাবনাকে একটা রূপ দেবার চেষ্টা করি।'

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'রাজা প্রবাহন প্রথম ব্রহ্মবাদের কল্পনা করেন। তিনি বলেছিলেন, 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আত্মা আছে। এই আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার মৃত্যু নেই এবং এই আত্মাই মৃত্যুর পর নবজন্ম লাভ করে।'

প্রত্যেক আত্মাই ব্রহ্মাত্মা বা পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত। পূর্বজন্মে পাপকর্মের ফল পরজন্মে প্রবাহিত হয়, তার কর্মফলের জন্য তাকে দুঃখ, কষ্ট, নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। পূর্বজন্মকৃত পুণ্যের জন্য কেউ রাজা হয়, রাজন্য-অনুগ্রাহী হয়, কেউ ব্রাহ্মণ হয়। পূর্ব জন্মে পাপের ফলে সাধারণ মানুষ কষ্ট ভোগ করে, কেউ দরিদ্র হয়, অনাহারী হয়, রোগগ্রস্ত হয় এবং দাস হয়। রাজা প্রবাহন বলেছিলেন, 'এই ধারণা, এই বিশ্বাস যদি ধর্মের মোড়কে মানুষের মনে গ্রথিত করা যায়, তাহলে রাজদণ্ড ও ব্রাহ্মণ পরম্পরা নিরবচ্ছিন্ন থাকবে।'

রাজা সুবাহন এবার বললেন, 'ঠিক বলেছেন। আপনারা জানেন, আমার পিতামহ ষষ্ঠ বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করেছেন। কিন্তু আমার পিতামহী বর্তমান রাজমাতা এখনও জীবিত।

তাঁর বয়সকাল নবতিবর্ষোত্তীর্ণ। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক এখনও আগের মতোই চলে। আমিও তাঁর কাছ থেকে পিতামহের এই পরিকল্পনার কথা শুনেছি। যদিও তাঁর প্রকাশটা একটু ভিন্নতর। তবু আমি তাঁর কাছ থেকে যা শুনেছি, তাই থেকেই পিতামহের এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি।'

আপনারাও একটু মস্তিষ্ক সঞ্চালন করুন। এই পরিকল্পনা কীভাবে রূপায়িত করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করুন। আমরা আবার আগামীকল্য এই রাজসভায় উপস্থিত হব, এই নিয়ে আলোচনা করব। অদ্যকার মতো এই রাজসভাকার্য সমাপ্ত হল।

— রাজমাতা লোপা, প্রণাম।

— কে? রাজা সুবাহন, স্বাগতম।

— কি হলো, দিদু, তুমি আমাকে রাজা সুবাহন বলে ডাকছ কেন?

— তুমিও তো আমাকে রাজমাতা লোপা বলে সম্বোধন করলে। না দিদু, আমি তোমার কাছে রাজাটাজা নই। আমি তোমার সুব্বু।

— তাহলে আমিও রাজমাতা নই। আমি তোমার দিদু।

— তুমি কী করছিলে দিদু?

— কী আর করব, এই বয়সে আর কিছু করার থাকে নাকি? শুধু পুরোনো দিনের কথা মনে করা। স্মৃতি ... স্মৃতি...

— এই বয়সেও যে তোমার স্মৃতি সব অটুটু আছে, এটা ভেবেই অবাক লাগে।

— না সুব্বু, কখনো ঝাপসা হয়ে যায়, আবার কখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রংগুলো বদলে বদলে যায়। কখনও রঙহীন হয়।

— রাজা প্রবাহনের স্ত্রী তুমি; তোমার স্মৃতির রঙ কখনও রঙ-হীন হতে পারে? তুমি নিজেই তো রঙের উৎস।

— ঠাকুরদার মতো খুব মন ভোলানো কথা বলতে শিখেছিস।

— ঠাকুরদা বুঝি খুব মন ভোলানো কথা বলতে পারত?

— পারত মানে? ওটাই তো তোর ঠাকুরদার সব ছিল রে। কথার ফুলঝুরি। শুধু কথা বলেই তো সব ওলটপালট করে দিতে পারত।

— বল না দিদু; ঠাকুরদার গল্প শুনতে খুব ভালো লাগে।

— অনেকবার তো শুনেছিস, আর কেন?

— তবু বলো।

— কত সুন্দরী মেয়েকে যে শুধু কথায় ভুলিয়ে অন্তঃপুরবাসিনী করেছে, তার ঠিক নেই।

— ওসব কথা ছাড়ো দিদু। রাজারা তো ইচ্ছে করলেই কত নারীকে অন্তঃপুরবাসনী করতে পারে।

— না না, সেরকম নয়। তোর ঠাকুরদা কখনো ক্ষমতাবলে অথবা অর্থ দ্বারা ক্রয় করে কোনো নারীকে অন্তঃপুরবাসিনী করেনি। শুধু কথা, শুধু কথায় বশ হত তারা।

— কিন্তু তোমাকেও তো ভীষণ ভালবাসত।

— তা বাসত। ভালবাসত বলেই সব কথা আমাকে এসে বলত। তবে ওটাও ঠিক, ছিল একেবারে মিছরির ছুরি। মিষ্টি কথার ফাঁকে কত দুর্বুদ্ধি যে খেলত তার মগজে। দাসদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করত যে মনে হত যে তারা দাস নয়, রাজার সমগোত্রীয়। কিন্তু দাস কেনাবেচার সময় এক নিষ্কও এদিক-ওদিক হতে দিত না। দাসবিক্রির সময় দাসদের স্বামী স্ত্রী বা সন্তান— কোনো সম্পর্ককে মূল্য দিত না। দাসীর কোল থেকে পুত্র বা কন্যাকে কেড়ে নিয়ে বিক্রি করতে তার এতটুকু মায়া হত না।

– দাসেদের ওপর মায়া দেখালে মানুষের চলবে কেন?

— ঠিকই বলেছ। তারাও মানুষ, তবে দাস।

— যাক, ওসব কথা ছাড়ো দিদু। ঠাকুরদার সেই ব্রহ্মবাদের গল্পটা বলো।

— মানুষকে ঠকানোর সবচেয়ে বড় ধাপ্পাবাজি! ভাগ্যিস ব্রহ্মবাদ সমাজের মধ্যে তেমন প্রচার পায়নি। ভাগ্যিস তোমার ঠাকুরদার মস্তিষ্কপ্রসূত ঐ ব্রহ্মবাদতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি! নাহলে এতদিনে রাজ্যের সব প্রজা দাসে পরিণত হত।

— কেন এ কথা বলছ দিদু?

— নয়তো কি? চতুর্বর্ণের ভাগাভাগি করাই ছিল। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা শুধু ভোগ করবে। বৈশ্যরাও তার ভাগ পাবে। কিন্তু সমাজের বৃহত্তর শ্রেণী শূদ্র, দাস ও সৈন্য। কেন? না, তাদের শ্রমের জন্যই তো ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা সুবিধাজনক জীবনযাপন করছে। এই নিম্ন শ্রেণীদের অবদমিত না রাখলে তো উচ্চ বর্ণের চলবে না! সুতরাং চতুর্বর্ণ, সুতরাং দাসপ্রথা। কিন্তু তাতেও এদের মন ভরছে না। নিম্নবর্ণের মানুষের চেতনা যে দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং উপায়? উপায় ব্রহ্মবাদ। এতদিন শুধু বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে তাদের অবদমিত রাখা যাচ্ছিল, এবার নতুন পন্থা— ব্রহ্মবাদ। মানুষের মগজ ধোলাই। তোর ঠাকুরদা বলতেন, ব্রহ্মবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলে আগামী ছাপ্পান্ন পুরুষ আর ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের কোনো চিন্তা থাকবে না। ছাপ্পান্ন পুরুষ ধরে পায়ের ওপর পা। ... ছাপ্পান্ন পুরুষ ধরে সাধারণ মানুষ ব্রহ্মবাদের নেশায় আচ্ছন্ন থাকবে।

— কিন্তু এই ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা পেল না কেন?

— কারণ পরিকল্পনা ছিল, প্রয়োগ হয়নি।

— কী রকম?

— তোমার ঠাকুরদার মস্তিষ্কপ্রসূত এই চিন্তা ছিল এইরকম— ব্রহ্মই পরমাত্মা। পরমাত্মার অংশ হল আত্মা, যা সকল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আত্মা ব্রহ্মেই উৎপত্তি, ব্রহ্মেই বিলীন। কিন্তু বিলীন হবার আগে তার রূপান্তর চক্র। অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদ। আত্মা দেহ ত্যাগ করে, আবার নতুন দেহ ধারণ করে। শুরু হয় নতুন জন্ম— পরজন্ম। পরজন্মেও শরীরের মৃত্যু হয়। আত্মা অবিনশ্বর থাকে। আবার নতুন শরীর ধারণ করে। আবার পুনর্জন্ম হয়।

— সে না হয় হল দিদু, কিন্তু তাতে মানুষকে অবদমিত রাখা যাবে কী ভাবে?

— হ্যাঁ, সে উপায়ও রাজা প্রবাহন ভেবে রেখেছিলেন। দুষ্ট আত্মা দুষ্কর্ম করে, সুতরাং পরজন্মে ফল। সে জন্ম নেবে শূদ্র বা দাস হিসাবে। অর্থাৎ শূদ্র বা দাস সমাজের সৃষ্টি নয়, সেই আত্মার নিজেরই সৃষ্টি, পূর্ব জন্মের পাপের ফল। আর ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়রা, তাদের পূর্বজন্মের আত্মা শুধু পুণ্য কাজ করেছিল, তাই এ জন্মে তারা উচ্চবর্ণের।

— কিন্তু এটা বোঝা যাবে কী করে?

— বোঝার তো দরকার নেই। অলীক গল্পের কোনো প্রমাণ হয় না। একই মিথ্যে কথা যেমন বারবার বললে কখনও কখনও তা সাধারণ মানুষের কাছে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, তেমনই 'আত্মা-পূর্বজন্ম' তত্ত্ব মানুষের মনে গেঁথে যায়, তাহলে ওই ঐ ছাপ্পান্ন পুরুষ! কিন্তু আমি এই ধাপ্পাবাজির প্রতিবাদ করতাম। রাজা হেসে উড়িয়ে দিতেন। তবে সৌভাগ্য যে এই ব্রহ্মবাদ প্রয়োগের অভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

— দিদু, পিতামহ এটাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন নাকি?

— হ্যাঁ, সুব্বু, তিনি চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ বস্তু ধর্ম সম্পর্কিত। তাই ক্ষত্রিয় দ্বারা এ তত্ত্ব প্রচার করা সম্ভব নয়। এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে প্রয়োজন। কিন্তু তিনি তেমন কোনো ব্রাহ্মণ পাননি, যাঁর দ্বারা এই তত্ত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যাক, যা হয়নি তা ভালই হয়েছে। সুব্বু, তুমি যেন কোনোদিন এ মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিও না। এ অসত্য, এ লোকঠকানো ধাপ্পাবাজি, এ মিথ্যাচার এবং মানবিকতার বিরোধী।

— কিন্তু দিদু, শাস্ত্রে যে বলে, রণে আর প্রেমে সব কিছুই সঠিক।

— সুব্বু, তুই মিথ্যেকথা বলে যত খুশি প্রেম করগে যা। সুন্দরী রমণীতে অন্তঃপুর ভরিয়ে ফেল। সেটা এক জন্মেই শেষ হবে। ছাপ্পান্ন প্রজন্মের মাথা খাসনি।

— তুমিও তো খুব সুন্দরী দিদু।

— এই যা ভাগ। বুড়ি ঠাকুমার মধ্যে আর সুন্দরী খুঁজতে হবে না। যা, অন্তঃপুরে অনেক যুবতী সুন্দরী আছে, তাদের সঙ্গে প্রেমালাপ কর গিয়ে। যা ভাগ।

সুবাহন ছদ্ম তিরস্কার শুনে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

গোধর এবং রামদাস বাল্য বন্ধু। এখন দুজনেই প্রৌঢ়। কিন্তু দুজনের বন্ধুত্ব এখনও অটুট।

— এই শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান ব্যাপারটা কী রামদাস? গোধর জিজ্ঞেস করল।

— কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছিস?

— না, ঐ নকুল পণ্ডিতের বাড়িতে হচ্ছে তো, তাই। অনেক ব্রাহ্মণ খাওয়া-দাওয়া করল, নকুলপণ্ডিত প্রচুর গোদান করল, সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে একশত পদ জমি দান করল। রামদাস একটু চুপ করে রইল, একটু ভাবল। বলল, 'এই শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান ব্যাপারটা আগে ছিল না। বর্তমান ব্রাহ্মণরা বিধান দিয়েছেন; পিতৃবিয়োগ, মাতৃবিয়োগ হলে, অন্তত বারোজন ব্রাহ্মণকে খাওয়াতে হবে, তন্ডুল ও অন্যান্য শস্য দান করতে হবে এবং গোদান ও ভূমিদান করতে হবে।

— কেন? গোধর জিজ্ঞেস করল।

— কারণ তাতেই নাকি মৃতের আত্মা শান্তি পাবে।

— মৃতের আত্মা! সেটা কী?

— ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যর তাপস জ্ঞান অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের শরীরে আত্মা আছে। সেই আত্মার শান্তির জন্য শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য।

— বুঝলাম না।

— আত্মা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ। আত্মা রূপে তা বিরাজ করে, আবার পরমাত্মায় বিলীন হয়। সেই আত্মার পুনর্জন্ম হয়। পূর্ব জীবনের কর্ম অনুযায়ী বর্তমান জীবনে তার ফল ভোগ করতে হয়। পূর্ব জীবনের পুণ্য কর্মের ফলে বর্তমান জীবনে মানুষ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হয়। পূর্ব জীবনের পাপ কর্মের ফলে মানুষ শূদ্র হয়, দাস হয়।

— তাই নাকি? তো এসব এরা কী করে জানল?

— ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাপস জ্ঞানে উপলব্ধি করেছেন, সেই জ্ঞান ব্রাহ্মণদের শিক্ষারূপে দান করেছেন।

— তুই এ সব জানলি কী করে?

— নকুলপণ্ডিতের পিতার শবদাহের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানেই এক বয়স্ক ব্রাহ্মণ নকুল পণ্ডিতকে এসব বলছিলেন, আমি শুনেছি। এও শুনেছি যে, এর আগেও দেশের বিভিন্ন স্থানে এই অনুষ্ঠান অতি সমাদরে সম্পন্ন হয়েছে।

— তো, এতে তো অনেক ব্যয় হবে। যাদের সেই সংস্থান

নেই, তারা কী করবে?

— করতে হবে। পিতা মাতার আত্মার শান্তির জন্য এই অনুষ্ঠান করতেই হবে। নচেৎ মৃতের আত্মা শান্তি পাবে না। প্রেত যোনিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

— আমাদেরও করতে হবে? মানে, আমরা যারা নীচ জাতি, চাষা ভুষো বা শ্রমিক বা রাজার সৈন্যদলে রয়েছে, তাদেরও করতে হবে?

— নিশ্চয়। নীচ জাতি তো পূর্বজন্মের পাপ কর্মজাত। এই জন্মেও যদি শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান না করি তাহলে তো পরজন্মে আরও নীচ জাতি, মানে শূদ্র বা দাস হতে হবে।

— যাদের এত সম্পদ নেই, তারা কী করে করবে?

— করতেই হবে। নিজের জমি, দরকার হলে বসতবাটী এবং তাও না থাকলে নিজের বিনিময়ে তা করতে হবে।

— নিজের বিনিময়ে মানে তো দাস হয়ে যাওয়া!

— তা হোক, কিন্তু ধর্মের অনুশাসন পালন করতেই হবে।

— কিন্তু আত্মা জিনিসটা কী, মাথায় ঢুকলো না তো।

— আমরা তো অনেক কিছুই তৈরি করতে পারি, কিন্তু তাতে প্রাণ দিতে পারি না, কেন? কারণ একমাত্র আত্মাই প্রাণের কারণ।

তখনকার দিনে মানুষ ছিল সরল, সাদাসিধে। উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষজন যা বলত, তাই তারা বিশ্বাস করত। উচ্চ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল বেদ— বেদজ্ঞান। তারা যা কিছু বলত, বলত বেদের দোহাই দিয়ে, এবং স্বল্প বিদ্যেবুদ্ধির মানুষ তাই জ্ঞানী মানুষের উপদেশ ভেবে গ্রহণ করত। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল। বিদূষী গার্গী এই আত্মা, পরজন্ম, শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন। দর্শন এবং তর্কশাস্ত্রে বিদূষী এই কন্যা প্রশ্ন তুললেন এর যৌক্তিকতা নিয়ে। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা শুরু হল। ব্রাহ্মণরা গার্গীকে বোঝাল যে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এই ব্রহ্মজ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু গার্গীর যুক্তিবাদী মন, দর্শনের জ্ঞান এবং তর্কশাস্ত্রের শ্রেণী তাঁকে এই ব্রহ্মবাদ সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলল। যে কোনো তত্ত্বেরই যেমন বিরোধী থাকে; এই আর্যাবর্তেও তার অভাব হল না। একদল মানুষ, যাদের কিছুটা বেদজ্ঞান আছে, তারা গার্গীকে সমর্থন করল। কিন্তু যেহেতু সাধারণ মানুষকে এটা বোঝানোর কোনো উপায় ছিল না, তাই গার্গী বাধ্য হয়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করলেন। রাজমাতা লোপা বাতায়ন প্রান্তে বসেছিলেন; সেখানে গার্গী প্রবেশ করল, 'পিসিদিদা, কেমন আছো গো?'

লোপা তাকালেন, গার্গীকে দেখে বললেন, 'গার্গী, আয়। বোস।' একজন পরিচারিকা একটা আসন এনে দিল।

লোপা এই বিদূষী কন্যাকে দেখলেন, তারপর বললেন, 'তোর এই পিসিদিদা ডাকটা কেমন অদ্ভুত। এটা কেমন যেন জগাখিচুড়ি সম্পর্ক।'

গার্গী বলল, 'তুমি ছিলে আমার মায়ের পিসির বন্ধু। সেই হিসেবে তুমি মায়ের পিসি। আবার মায়ের পিসি মানে আমার দিদা। তাই পিসিদিদা। ভুল কী হল?'

— তুই তো তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত; তোর সঙ্গে তর্কে কি আমি পারি? কেমন আছিস বল মা। তোর মা কেমন আছে?

— আমি ভালো আছি গো। তবে মায়ের অম্লশূলটা আবার বেড়েছে। খাওয়াদাওয়া কমে গেছে। শরীরটাও ভেঙ্গে গেছে।

— রাসু-বদ্যি তো তোদের বাড়ির কাছেই থাকে; তাকে একবার দেখালি না কেন?

— দেখিয়েছি গো পিসিদিদা। ঔষধ দিয়েছেন, পথ্য বাতলে দিয়েছেন। তবু এখনো তো কমছে না।

— তোর মাকে সক্তুটা কম খেতে বল। তার চেয়ে বরং গোধূম ভাল। আরো ভালো হয় তন্ডুল পথ্যে।

— পিসিদিদা, তুমিও তো অনেক কিছু জানো। লোপা বদ্যি নাম নিয়ে তুমিও এবার মানুষের চিকিৎসা শুরু করো না।

— হ্যাঁ, এই শতবর্ষের দোরগোড়ায় এসে এবার ঐ সব করি আর কি!

— না গো পিসিদিদা, রসিকতা করছিলাম। তবে তুমি এখনো বেশ শক্তপোক্ত আছো। চোখের দৃষ্টি এখনো বেশ স্বচ্ছ। আর...

— থাম গার্গী, কী যুগ এলো! এর চেয়ে বোধহয় স্মৃতিভ্রংশ হয়ে, দৃষ্টি ধূসর হয়ে কিম্বা মানে সরে পড়াই ভালো ছিল। এসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখতে হত না।

— তুমি কোন অনাসৃষ্টির কথা বলছো?

— কেন, তোদের ঐ ব্রহ্মজ্ঞান! যা দিয়ে তোরা মানুষের মগজ ধোলাই করছিস।

— কিন্তু দিদা আমি তো—

— জানি তুই এ সবের মধ্যে নেই। খবর সবই পাই। তুই বরং এই ভণ্ডামির প্রতিবাদ করেছিলি।

— তুমি জানো?

— আমি সবই জানি, সব খবরই পাই। এমনকি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে তোর তর্কযুদ্ধের খবরও জানি।

— দিদা!

— আমি গত সত্তর বছর ধরে এই বদমাইসির কথা জানি।

— সত্তর বছর!

— হ্যাঁ রে গার্গী, আমার স্বামী মানে তোর পিসেদাদু এই পরিকল্পনা করেন। আমি আপত্তি জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু

রাজচিন্তাকে আটকাব, সাধ্যি কী আমার? অবশ্য প্রয়োগের অভাবে তা তখন কার্যকর হয়নি। কিন্তু রাজা প্রবাহনের পৌত্র রাজা সুবাহন এই বদমাইসিটা প্রয়োগ করার জন্য ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে পেল। প্রথমে হল ব্রাহ্মণদের মগজ ধোলাই এবং অন্য বর্ণকে অবদমিত রাখার কৌশল। এবং শেষে সাধারণ মানুষ। ধর্ম সভায় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই যে ব্যাখ্যা দিল— খুব ভালো বাগ্মী তো— মানুষকে কথার জালে জড়িয়ে এই ব্রহ্মবাদের সূচনা করল।

— কিন্তু পিসিদিদা, বেদজ্ঞানীরা একথা শুনল কেন?

— কিছু বেদজ্ঞানী শুনল নিজেদের স্বার্থে, আর কিছু বেদজ্ঞানী প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যর সঙ্গে কথায় পারবে কী করে? তা মা, তুইও তো প্রতিবাদ করেছিলি, যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছিলি, তারপর মাঝখানে হঠাৎ চুপ করে গেলি, তাই তো?

— তুমি এত খবর জানো পিসিদিদা? জানো পিসিদিদা, কার্যকারণ সূত্র ধরে আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছিলাম। যাজ্ঞবল্ক্যও ভালো তার্কিক এবং বাগ্মী। কিন্তু এবারে আমি প্রায় বিজয়িনী হয়ে গিয়েছিলাম।

— প্রায় বললি কেন?

— দিদা, আমি যখন যুক্তি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে এই আত্মা, পরজন্ম শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাকে ধূলিসাৎ করে ফেলেছি, তখনি যাজ্ঞবল্ক্য সেই কথাটা উচ্চারণ করল —

— কী কথা?

— সমস্ত কার্যকারণ সূত্র যখন আমার পক্ষে, আমার বিজয় অবশ্যম্ভাবী, ঠিক তখনি, তর্কযুদ্ধের শেষ প্রান্তে এসে, যাজ্ঞবল্ক্য বারে বারে সব কার্যর কারণ হিসাবে বলতে শুরু করল— 'কারণ ঈশ্বর'। উনি কিছুতেই, কোনোভাবেই আর যুক্তি দিয়ে পারছিলেন না। তখন চূড়ান্ত কারণ হিসাবে ঈশ্বরকে টেনে আনছিলেন। শেষে বাধ্য হয়ে আমি যখন জানতে চাইলাম — 'ঈশ্বরের কারণ কী'? তখনই সেই মোক্ষম অস্ত্রটি উনি ব্যবহার করলেন। উনি বললেন, 'ঈশ্বরের কারণ আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করব না। তবে দ্বিতীয়বার ঐ প্রশ্ন করলে, আমার ব্রহ্মতেজে বিদূষী গার্গীর মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে'।

— লোপা এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিলেন, বললেন, 'বাহ, চমৎকার, তর্কে হেরে গিয়ে তখন শক্তিপ্রদর্শন।'

গার্গী বৃদ্ধার মুখে যেন যাজ্ঞবল্ক্যর প্রতি ঘৃণা দেখতে পেল। বলল, 'দিদা, সত্যিই কি ঈশ্বরের কারণ দ্বিতীয়বার আনতে চাইলে আমার মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যেত?'

— যেত, তবে তা যাজ্ঞবল্ক্যর ব্রহ্মতেজে নয়। এর আগে যত মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়েছে, ঠিক সেই ভাবেই তোর মাথাটাও আলাদা হয়ে যেত। পেছনে প্রহরায় সান্ত্রী ছিল তো? যাজ্ঞবল্ক্যর অঙ্গুলি হেলনে সান্ত্রীর তরবারির এক কোপে তোর মাথাটাও আলাদা হয়ে যেত।

সনাতন উবাচ সমাপ্ত

এবার আমি সনাতনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই এসব জানলি কী করে?'

সনাতন উত্তর দিল, 'প্রবাহনের ছাপ্পান্ন পুরুষ নয়, ছাপ্পান্ন দুগুণে একশো বারো পুরুষ ধরে আর্যাবর্তের মানুষ এখনও আত্মা, পরজন্ম, শ্রদ্ধা (শ্রাদ্ধ) অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করে চলেছে, দেখতে পাস না? এখনও ঐ ব্রহ্মবাদ মানুষের মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, হাঁড়িকাঠে গলা দেবার জন্য মানুষ এখনও কেমন তৈরি, বুঝতে পারিস না? মানবিকতার এই অপমান, এই গ্লানি, এই অধর্ম এখনও বর্তমান।

অনুপ্রেরণাঙ্ক রাহুল সংকৃতয়নের 'ভোলগা সে গঙ্গা' গ্রন্থ।

উমা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থানঙ্ক পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর ঙ্ক ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

উৎস মানুষ পত্রিকা ও বই পেতে যোগাযোগ করুন

দীপক কুন্ডু

২৯/৩ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন

কলকাতা - ৭০০০১২

(কলেজ স্ট্রীট কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)

ফোন নং — ৯৮৩০২৩৩৯৫৫

পাঠানি চন্দ্রশেখর

সমীরকুমার ঘোষ

২০১৩-র অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় ‘এক জ্যোতিষ্ক ও তাঁর আবিষ্কারক’ শিরোনামে শুরু হয়েছিল একটা লেখা। ওড়িশার দুর্গম এক গ্রামের এক অখ্যাত জ্যোতির্বিদকে নিয়ে। নাম সামন্ত চন্দ্রশেখর। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি আবিষ্কার করেছিলেন জ্যোতির্বিদ্যার এই জ্যোতিষ্কটিকে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন গোটা বিশ্বের সঙ্গে। নাসা বাধ্য হয়েছিল তাঁকে কুর্নিশ জানাতে। মাঝে ২০১৪-র জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় বাদ পড়ে গিয়েছিল। এবারের প্রতিবেদন আগের লেখারই জের।

আমাদের দেশে দু ধরনের মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। এক ধরনের মানুষ বাকসর্বস্ব। মুখেন মারিতং জগৎ। ওঠো জাগো, ইহা করিতে হইবে, উহা গড়িতে হইবে, জাতীয় ভাষণ দিয়ে খালাস। আমরা সেই বাণী শুনে না উঠলে বা না জাগলেও ওঠো, জাগো মার্কা বাণীদাতাতে মুগ্ধ, ভক্তিগদগদ। ছবি টাঙিয়ে, রাস্তা-ক্লাবের নাম রেখে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের হদ্দমুদ্দ করে ছাড়ি। এর বিপরীতে থাকেন আরেক দল, যাঁরা বলিষ্ঠ, জ্বলন্ত, জ্বালাময়ী, প্রেমময় কোনো ধরনের ভাষণই দেন না। চুপচাপ কাজ করে যান। দর্শনের ক্ষেত্রে যেমন ব্রজেন শীল, কালিদাস নাগ, সুরেন দাশগুপ্ত, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়া রাজনীতিতে সূর্য সেনেরা এই দলে পড়েন। এই দ্বিতীয় দলে পড়া এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কথা বলার জন্যই এত ভূমিকা। নাম সামন্ত চন্দ্রশেখর। নামটা শুনে অনেকেই ভুরু কোঁচকাতে পারেন। অচেনা, অশ্রুত লোককে হঠাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানী বানিয়ে দেওয়ায় বিরক্তও হতে পারেন। তা হোন। কিন্তু জেনে রাখা ভাল, এ আমাদের ব্যর্থতা, অপদার্থতা এমন একটা মানুষকে ভুলে মেরে দেওয়ার জন্য।

সেটা ১৮৩৫ সাল। ভারতের রাজধানী শহর কলকাতা। দু বছর আগে তারই অদূরে কামারপুকুরে জন্মেছেন গদাধর চট্টোপাধ্যায় ওরফে শ্রীরামকৃষ্ণ। জন্মেছেন মহেন্দ্রলাল সরকার। রামমোহনের মৃত্যুও হয়েছে। ৩৫ সালে স্থাপিত হয়েছে মেডিক্যাল কলেজ। ইংরেজি ভাষার সাহায্যে প্রবর্তন হয়েছে উচ্চশিক্ষার। এরই দু বছর পর ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেছেন ভিক্টোরিয়া। আর ১৮৩৮ তো গৌরবজনক সাল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ জন্ম নিয়েছেন। ঠিক সেই সময়, ১৮৩৫-এ বাংলা থেকে বহু দূরে ওড়িশার খন্দপাড়ায় এক রাজপরিবারে জন্ম নেন ‘মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহ হরিচন্দন মহাপাত্র সামন্ত’। যিনি সামন্ত চন্দ্রশেখর নামেই বেশি পরিচিত। ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদদের একজন। আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, বরাহমিহির, শতনন্দ, শ্রীপতিদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয় সামন্ত চন্দ্রশেখরের নাম।

কী করেছিলেন এই চন্দ্রশেখর? হাজার বছর ধরে চলে-আসা ভুল হিসেব শুধরে দিয়েছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তথা জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর্যভট, ভাস্কররা অনবদ্য কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাজ ছিল পুরোপুরি তাত্ত্বিক। হাতেকলমে করে তা মিলিয়ে নেওয়ার অবকাশ তাঁরা পাননি। বা সেই কাজটা তাঁরা করতে পারেননি। ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে আর্যভট জন্মগ্রহণ করেন বিহারের পাটলিপুত্র বা পাটনায়। তখন গুপ্তযুগ। বিজ্ঞান ও

সাহিত্যে রচিত হচ্ছে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আর্যভট মাত্র ২৩ বছর বয়সে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আর্যভটীয়' রচনা করেন। তখন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আসীন বুদ্ধগুপ্ত। ১১১৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নেন ভাস্কর। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন ভারতীয় গণিতজ্ঞ দেশ-বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এমনকি বিদেশি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন ব্রহ্মগুপ্ত। ওঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত'।

এটা সবার জানা, জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা সভ্যতার একেবারে শুরু থেকেই চলছে। তখন খালি চোখেই মানুষ আকাশ ও গ্রহনক্ষত্র দেখে প্রকৃতির রহস্য বুঝতে চাইত। এমনটা চলেছিল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তারপরই চিত্রটা বদলাতে থাকে গ্যালিলিওর অপটিক্যাল টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর। পশ্চিমে জ্যোতির্বিজ্ঞান এগিয়ে যেতে থাকে হু হু করে। আর আমাদের ভারতবর্ষে! সেই বেদের আমল থেকে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করছি। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে এসেছেন আর্যভট, ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্তরা। কিন্তু সবটাই হয়েছে খালি চোখে দেখার ভিত্তিতে। অসাধারণ গাণিতিক প্রতিভাধরদের বহু ক্ষেত্রে হিসাবে বা অনুমানে ভুল হয়েছে। তবুও যে কাজ হয়েছে, তা সমীহ জাগানোর মতো। তারপর? অন্য কোনো জুতসই শব্দ না থাকায় 'দুর্ভাগ্য' শব্দটাকেই ব্যবহার করে বলতে হয়, জ্যোতির্বিদ্যার মহাসাগর ছেড়ে আমাদের প্রতিভাধর গাণিতিকরা বাঁক খেয়ে গিয়ে পড়েন জ্যোতিষের এঁদো ডোবায়! জ্যোতির্বিজ্ঞানী অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তো বরাহমিহিরকেই যত নষ্টের মূল বলে মনে করেন। মহান ঐতিহ্য নিয়েও আমরা হারিয়ে যাই দৌড় থেকে। রক্ষা করতে পারি না সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে।

হতাশাজনক এই পরিস্থিতিতেই আশার আলো দেখান সামন্ত চন্দ্রশেখর। এক বর্ণ ইংরেজি জানতেন না। ওড়িশার দুর্গম এক জেলায় থেকে পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিদ্যার খবরাখবর জানার তো প্রশ্নই নেই। জানার মধ্যে জানতেন মাতৃভাষা ওড়িয়া ও সংস্কৃত। জ্যোতির্বিদ্যার ওপর প্রবল আগ্রহের কারণেই খুব ছোট বয়স থেকে মন দিয়ে পড়া শুরু করেছিলেন প্রাচীন পুঁথিপত্র। কিন্তু সেই অধীত জ্ঞান দিয়ে বাস্তবকে মেলাতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছিলেন। হিসাব মিলছিল না। হাল ছাড়েননি যুবক পাঠানি। শেষমেশ নিজে তৈরি করলেন যন্ত্র। তত্ত্ব ও প্রয়োগকে মেলাতে গিয়ে বুঝতে পারলেন প্রাচীন পুঁথিতে অনেক গলদ রয়েছে। হাত লাগালেন সংশোধনের কাজে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় হয়ে উঠলেন নয়া ভগীরথ। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার দুই আকর গ্রন্থ 'সূর্য সিদ্ধান্ত' ও 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'র ত্রুটি শুধরে তৈরি করলেন 'সিদ্ধান্ত দর্পণ'। যথার্থ নাম।

চন্দ্রশেখর জন্মেছিলেন ওড়িশার খণ্ডপাড়ার রাজ পরিবারে। ১৩ ডিসেম্বর ১৮৩৫ সালে। শকাব্দের হিসাবে ছিল ১৯৫৭, পৌষ কৃষ্ণঅষ্টমী। খন্দপাড়া ছিল রাজাশাসিত রাজ্য মানে প্রিন্সলি স্টেট। বর্তমানে এটি ওড়িশার নয়াগড় জেলায় পড়ে। এটি গড়জাট রাজশাসিত ছিল। ব্রিটিশ আমলে তারা কিছুটা স্বায়ত্তশাসন পেয়েছিল। ছোট্ট এই রাজ্যের পরিধি ছিল মাত্র ২৪৪ বর্গ মাইল। রাজধানী ছিল এক ছোট শহর, নাম খণ্ডপাড়া। নয়াগড় থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই অঞ্চলটি ছিল পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা। এই রাজত্ব স্থাপিত হয় ১৫৯৯ সালে। চন্দ্রশেখর সামন্তের সময়ে এই রাজ্য শাসন করত তাঁর ভাগ্নে। একাদশ সেই রাজার নাম ছিল নটবর সিং মর্দরাজ। সামন্তর বাবা স্বয়ম্ভুনাথ ও মা বিষ্ণুমালী। ওঁরা ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। ওঁদের নটি কন্যা ও এক পুত্রের পরে জন্ম নেয় পাঠানি। একেবারে শিশু বয়সেই দুই মেয়ে ও একটি ছেলে মারা যায় বলে বাবা-মা চন্দ্রশেখরের নাম রাখেন 'পাঠানি'। সেই কারণেই রাজ্যবাসী তাঁকে ভালবেসে 'পাঠানি চন্দ্রশেখর' বলতেন। একেবারে শিশু বয়সে বাবার কোলে চড়েই তাঁর গ্রহনক্ষত্র চেনা। স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ শিক্ষকের কাছে মাতৃভাষা ওড়িয়া এবং সংস্কৃত ভাষার প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিলেন। প্রথাগত শিক্ষায় ওইখানেই ইতি। কিন্তু বালক পাঠানির জানার তৃষ্ণা তাতে মেটেনি। রাজবাড়িতে ছিল বিশাল গ্রন্থাগার। সেটাই হয়ে ওঠে পাঠানির প্রিয় জায়গা। বুভুক্ষুর মতো পড়তে থাকেন লীলাবতী, বীজগণিত, জ্যোতিষ, সিদ্ধান্ত, সংস্কৃত ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন। মূল ভাষাতেই পড়ে ফেলেন অনেক সংস্কৃত কাব্য। তবে এত ধরনের বই পড়লেও তাঁকে বেশি করে টানত গণিত আর জ্যোতির্বিদ্যা। গণিতের রহস্যভেদ করা হয়ে ওঠে তাঁর প্রিয় বিনোদন। আর রাতের আকাশে বিশ্ব যখন নিদ্রামগন পাঠানি অবাক বিস্ময়ে দেখতেন আকাশ। গ্রহতারক, চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুতবেগে কীভাবে ঘুরছে জানায় মগ্ন হয়ে যেতেন। মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে এক একাকী মানব বিস্ময়ের পর্দা সরিয়ে বুঝতে চাইতেন সব কিছু।

পাঠানির বয়স যখন পনের, তখনই তিনি জ্যোতির্বিদ্যার অনেক কিছু জেনে ফেলেছিলেন। জেনেছিলেন 'লগ্ন' কাকে

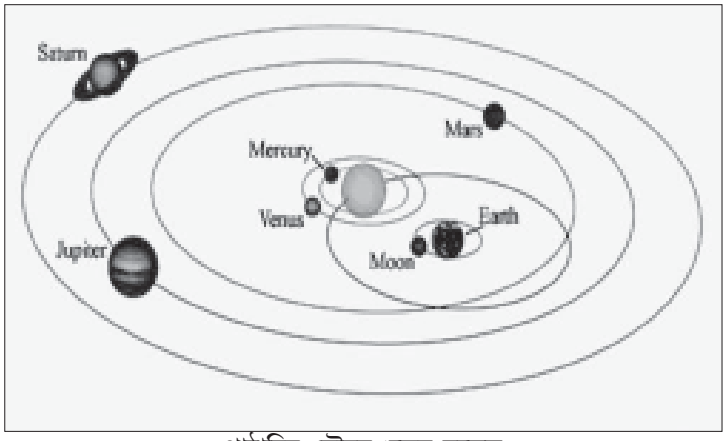

পাঠানির সৌরমণ্ডলের মডেল

বলে। কীভাবে গ্রহের রাশিচক্র গণনা করতে হয় তাও শিখেছিলেন। নতুন কিছু শিখলেই মনে হয় প্রয়োগ করে দেখি। পাঠানির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। কিন্তু অধীত বিদ্যাকে বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে গিয়েই শুরু যত গোলমালের। দেখেন সিদ্ধান্ততে যে হিসাব দেওয়া আছে গ্রহ ও নক্ষত্রের উদয় ও আবির্ভাবের সঙ্গে তা মিলছে না। জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে যে সব পুঁথি তখন পাওয়া যেত, তাতে ওই ধরনের পর্যবেক্ষণের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি লাগবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই লেখা থাকত না। মাপজোকের কথা ইতস্তত দু-এক জায়গায় উল্লেখ থাকত মাত্র। পাঠানি হালছাড়ার পাত্র ছিলেন না। তৈরি করে নিতে লাগলেন গবেষণার যন্ত্র। পরে যেটা আমরা জগদীশচন্দ্র বসুর ক্ষেত্রেও দেখেছি। উনি নিজের গবেষণার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিজেই গড়িয়ে নিয়েছেন। এখন অনেকেই মনে করেন উচ্চতর গবেষণার জন্য আমেরিকার মতো দেশে না গেলেই নয়। কারণ এ দেশে অত উন্নতমানের গবেষণাগার কই! যন্ত্রপাতি কই! তাঁদের কথা যে কতটা অসার, তারই উজ্জ্বল উদাহরণ পাঠানি-জগদীশচন্দ্ররা। উদ্ভাবনী মস্তিষ্ক থাকলে হাতের কাছে থাকা জিনিসপত্র দিয়েই তৈরি করে নেওয়া যায় প্রয়োজনীয় উপকরণ। পাঠানি বাঁশ দিয়ে তৈরি করেছিলেন দূরবীক্ষণ যন্ত্র। সাইকেলের চাকাকে ব্যবহার করেছিলেন রাশিচক্র গণনার জন্য। তৈরি করেছিলেন সময় মাপার নানা যন্ত্রও। পরে তাঁর তৈরি যন্ত্রপাতির কথা সবিস্তার বলা যাবে।

এই সময় তিনি দিনে ও রাতে গ্রহতারাদের চলন লক্ষ্য করতে থাকেন। আগের কাজের সঙ্গে নিজের পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যকে মেলাতে থাকেন। এটা করতে গিয়েই দেখেন, জ্যোতিষবিদ্যার দুই আকর গ্রন্থ 'সূর্য সিদ্ধান্ত' ও 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'তে দেওয়া তথ্যও অনেক সময় মিলছে না। পাঠানি বুঝলেন, এগুলোর সংশোধন করা দরকার। এ নিয়ে যে অন্য কারও সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন, কিংবা কোনো বিশেষজ্ঞ যিনি এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন, তেমন কেউই তাঁর ত্রিসীমানায় ছিলেন না। অগত্যা সেই গুরুদায়িত্ব তাঁকে নিজের কাঁধেই তুলে নিতে হয়। নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্য লিখে রাখতে শুরু করেন। তা থেকে তৈরি করেন সূত্র। এসব যখন করছেন, তখন তাঁর বয়স মাত্রই ২৩ বছর। তারপর তিন বছর ধরে নিজের হিসেব-নিকেশ সংশোধন আর মাজাঘষার কাজ করেন। সিদ্ধান্ত দর্পণের পুরো পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে যায় ১৮৬৯ সালের মধ্যে। তখন তাঁর বয়স ৩৪। প্রথমে সমস্ত সূত্র লিখেছিলেন তালপাতার ওপর। ওড়িয়া ভাষায়। পরে তাকে দেবনাগরী ভাষায় রূপান্তর করেন। সেই দেবনাগরী ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপি ছাপাতে অবশ্য লেগে যায় আরও ৩০টা বছর। এই কাজে পাঠানি তাঁর প্রধান উৎস হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন সূর্য সিদ্ধান্তকে। আর সিদ্ধান্ত শিরোমণি ছিল তাঁর পথপদর্শক।

একটা ছোট পাহাড়ি রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে বসে এই যে এত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পাঠানি চন্দ্রশেখর করলেন, তা কেউই কোনোদিন জানতে পারত না। কারণ পাঠানি এক বর্ণ ইংরেজি জানতেন না। ইংরেজি শিক্ষিত তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগও ছিল না। সংস্কৃত-জানা অনেক পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার গূঢ় তত্ত্ব বোঝা তাঁদের সাধ্যাতীত ছিল। তবুও তাঁর অসামান্য এই কাজ হারিয়ে গেল না। তার কারণ কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের কাছে কোনোভাবে তাঁর কথা পৌঁছে যাওয়া।

মহেশচন্দ্রই পঞ্জিকা সংস্কারের সময় এক রকম ঠেলেই কটক কলেজের (এখন যা র‍্যাভেনশ কলেজ নামে পরিচিত) অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে পাঠিয়েছিলেন দূর ওড়িশায় চন্দ্রশেখর পাঠানির কাছে। পাঠানির পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ যোগেশচন্দ্র ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লিখে গোটা বিশ্বের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। আর মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন নিজে উদ্‌যোগ নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ অবদানের জন্য মহোমহাপাধ্যায় উপাধি পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য তার আগেই পুরীর গজপতি রাজা তাঁকে 'হরিচন্দন মহাপাত্র' সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। (ক্রমশ)

উমা

শ্বেতশুভ্র পাঁচটি বিষ

পর্ব ১ঃ পরিশোধিত নুন

গৌতম মিস্ত্রি

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি আপ্তবাক্য স্মরণীয়— পাঁচটি সাদা বিষ থেকে দূরে থাকুন। (১) প্যাকেটবন্দী পরিশোধিত নুন, (২) চিনি, (৩) দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, (৪) সাদা সরু ও চকচকে পালিশকরা চাল এবং (৫) সাদা আটা, ময়দা ও তার থেকে ঘরে প্রস্তুত করা রুটি অথবা বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত করা বিস্কুট, পাউরুটি, কেক, কুকিজ ইত্যাদি অসংখ্য বেকিং করা খাবার। প্রথম পর্বের আলোচনা নুন নিয়ে।

পরিশোধিত সাদা নুন পরমাণু বোমার চেয়েও ভয়ানক

গুহাবাসী মানুষ নিজেদের উন্নত করতে আগুনের ব্যবহার শেখার সঙ্গে সঙ্গে শিকার-করা মাংস ঝলসে খেতে শিখেছিল। এর পরে কেটে গেছে বহু যুগ। স্থান ও কালভেদে রান্না করার অসংখ্য উপায় আমরা শিখে গেছি, আরও অসংখ্য রন্ধনপ্রণালী টেলিভিশনের পর্দায় অহরহ আমাদের লালাগ্রন্থিকে উত্তেজিত করে চলেছে। প্রাথমিকভাবে গুহাবাসী মানুষ উদ্বৃত্ত খাবার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলস্বরূপ এক সময় খাদ্যে নুন মিশিয়ে সফল হলেও আমরা, উত্তরসূরিরা, অস্বাস্থ্যকর লবণাক্ত খাবারে অভ্যস্ত হয়ে ক্রমশ জিভের অভ্যাস বদলে ফেললাম। এটা যে কেবল অস্বাস্থ্যকর তা নয়, অপ্রয়োজনীয়ও বটে। খাদ্যে অতিরিক্ত নুন না মেশালেও প্রাকৃতিক খাবারে নুনের দৈনিক প্রয়োজন (৬ গ্রাম) মিটে যায়। শৈশব থেকে অভ্যাস না করলে অথবা প্রাপ্তবয়সে স্বাস্থ্যের কারণে আলাদা করে নুন খাওয়া ছেড়ে দিলে নুনছাড়া খাবারের স্বাদগ্রহণে অসুবিধা হয় না। তিব্বতীরা চায়ে নুন মিশিয়ে পান করলেও আমরা নুন ছাড়া চা দিব্যি উপভোগ করতে পারি। নুনে অভ্যস্ত না হওয়া কিছু জনগোষ্ঠী অতিরিক্ত নুন ছাড়াই সারাজীবন দিব্যি কাটিয়ে দেয়। কোরিয়ার লুও প্রজাতি (লুও ট্রাইব) খাদ্যে নুন মেশানোর ব্যবহার শেখে নি আর তাদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে কম। আবার শহরাঞ্চলে বসবাসকারী লুও প্রজাতির বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে নুনের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উচ্চ রক্তচাপ ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য রোগের প্রকোপও বেড়ে যেতে দেখা গেছে।[১] যদিও আমাদের শরীরে সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাড়াও আয়োডিন, ফ্লুরিন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়ামমের মতো অন্য বেশ কিছু নুনের প্রয়োজন আছে। বিকৃত খাদ্যাভ্যাসের তাড়নায়, সচেতনভাবে আমরা কেবল সোডিয়াম ক্লোরাইড নামক নুনের প্রয়োজন অনুভব করি। খাবারের টেবিলে বসে ভাত মাখার আগেই এক খাবলা নুন ছড়িয়ে নিই। আমাদের রক্তে নুনের (সোডিয়াম ক্লোরাইড সহ অন্যান্য লবণ) মাত্রা সুদূর অতীতের কলুষমুক্ত সমুদ্রের লবণাক্ত জলের বিভিন্ন নুনের মাত্রার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যায়। সমুদ্রের অসংখ্য প্রাণী তো সেই জলেই পরিপুষ্ট হয়। খাবারে নুন মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যেসটা অপ্রয়োজনীয়; জৈবিক প্রয়োজনে অন্যান্য লবণের মতো সোডিয়াম ক্লোরাইড বা নুনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিশোধিত প্যাকেটজাত নুনের প্রয়োজন নেই।

কিঞ্চিৎ রসায়ন

রাসায়নিক অভিধান অনুযায়ী, লবণ হল অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন এবং ধাতব মৌলের সঙ্গে অধাতব মৌল অথবা র‍্যাডিক্যালের সমন্বয়ে গঠিত এক শ্রেণীর যৌগ। এই শ্রেণীভুক্ত যৌগের মধ্যে কেবল সোডিয়াম ক্লোরাইড (এই নিবন্ধে নুন বলে অভিহিত) শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় একটি অত্যন্ত সক্রিয় লবণ। দেহকোষের স্তরে সকল শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় সোডিয়াম আয়নের মুখ্য ভূমিকা আছে। হৃদস্পন্দনের জন্য, এক স্নায়ুকোষ থেকে অন্য স্নায়ুকোষে বার্তা প্রেরণের জন্য, মাংসপেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণের জন্য, মায় এই নিবন্ধটি পড়ার জন্য আমাদের দেহকোষে সোডিয়াম আয়নের সুনির্দিষ্ট মাত্রায় ও পথে চলাচল করা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিকগণ রক্তে সোডিয়ামের স্বাস্থ্যকর মাত্রা নির্ধারণ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে খাবারে অতিরিক্ত নুন খেলে রক্তে উপরোক্ত মাত্রা বজায় রাখতে গিয়ে সোডিয়াম নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার ওপর চাপ পড়ে। প্রয়োজনের বেশি নুন খাওয়ার ফলে, রক্তের ঘনত্ব বজায় রাখতে, নুনের সঙ্গে শরীরে জলও জমতে থাকে। খাবারে দৈনিক নুন গ্রহণের মাত্রার তারতম্য ঘটলেও বৃক্কের (কিডনি) প্রয়োজনভিত্তিক নুন-নিয়ন্ত্রক ক্ষমতার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষতিসাধন হয় না। সেই অতিরিক্ত নুন বর্জনের প্রক্রিয়াস্বরূপ বিভিন্ন উৎসেচকের (renin-aldosterone-angiotensin system, Atrial natriuretic peptide) প্রভাবে রক্তচাপ বেড়ে যায়, যার ফলে বৃক্কের নুন বর্জনের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। মানুষ ও সমশারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সম্পন্ন প্রাণীর ওপরে চালানো বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মাত্রাতিরিক্ত নুন গ্রহণের ফলে বৃক্কের অতিরিক্ত

নুন বর্জনের বোঝার সঙ্গে উচ্চরক্তচাপের যোগাযোগ প্রমাণিত।[২]

প্রাথমিকভাবে রক্তচাপ বেড়ে যাওয়াটা তাই তাৎক্ষণিকভাবে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার অনুকূল (প্রয়োজনের অতিরিক্ত নুন বর্জনের জন্য)। কিন্তু এই অসমহারে অধিক নুন গ্রহণের প্রক্রিয়া চলতে থাকলে পাকাপাকিভাবে রক্তচাপ বেড়ে যাবার আশঙ্কা তৈরি হয়। প্রয়োজনের বেশি নুন খেলে এই ক্ষতিসাধন অবশ্য কিছু মানুষের হয় না। যাদের হয় তাদের নুন সংবেদনশীল (sodium sensitive) বলে। বেশি করে নুন খাওয়ার জন্য উচ্চরক্তচাপ ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য রোগ এদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। খাবার নুন অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের বদলে একটু অন্য ধরনের লবণে (যেমন পটাশিয়াম ক্লোরাইড বা সোডিয়াম বাই কার্বোনেট) এমন ধরনের ক্ষতি হয় না। বরং, সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে পটাশিয়াম ক্লোরাইড খেলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের বিষক্রিয়া কিছুটা কম হয়। আফ্রিকার বংশোদ্ভুত আমেরিকাবাসীদের এক সমীক্ষায় খাদ্যে পটাশিয়ামের ঘাটতিতে সোডিয়াম সংবেদনশীলতা ভয়ঙ্কর রকম বেড়ে যেতে দেখা গেছে, যার ফলে বেশি নুন গ্রহণে তাদের উচ্চরক্তচাপ বেশি মাত্রায় সংগঠিত হতে দেখা গেছে।[৩] আধুনিককালের সর্ববৃহৎ মারণরোগ হিসেবে হৃদরোগ ও সেরিব্রাল স্ট্রোক ইতিমধ্যে কুখ্যাত। এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, উচ্চরক্তচাপ নিবারণ বা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এই মারণরোগ থেকে পৃথিবীর সব দেশের ব্যক্তিবিশেষ অথবা রাষ্ট্রীয় সার্বিক ও আর্থিক ক্ষতির সবচেয়ে সফল প্রতিরোধ সম্ভব। যে সব জনগোষ্ঠীতে দৈনিক নুন হিসেবে সোডিয়াম গ্রহণের পরিমাণ ১.২ গ্রামের কম, তাদের মধ্যে উচ্চরক্তচাপ বিরল। অপরদিকে উচ্চরক্তচাপ সেই সব জনগোষ্ঠীতেই দেখা যায়, যাদের নুন হিসাবে সোডিয়াম গ্রহণের পরিমাণ ২.৩ গ্রামের বেশি।[৪,৫] এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, উচ্চরক্তচাপ সংঘটিত হবার জন্য দৈনিক নুন গ্রহণের একটি বিপদসীমা (threshold) আছে, আর নুনের এই রক্তচাপ বাড়ানোর ক্ষমতা অন্যান্য রোগোৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ স্থূলতা, পরিশ্রমবিমুখতা, জিনগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির উচ্চরক্তচাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতার সঙ্গে মাত্রাছাড়া নুন গ্রহণের রক্তচাপ বাড়ানোর ক্ষমতা যোগ হয়ে যায়। আমেরিকায় কেবল এই বিপদসীমার ঊর্ধ্বে নুন গ্রহণের জন্য প্রতি বছর প্রায় ১৫০,০০০জনের অকালমৃত্যু হয়। সচেতন নয় এমন ব্যক্তির দৈনিক নুন গ্রহণের পরিমাণ ৮ থেকে ১০ গ্রাম। ২০১০ সালে আমেরিকার কৃষি, স্বাস্থ্য ও মানবকল্যাণ দপ্তরের নির্দেশিকার মতে অধিকপক্ষে দৈনিক ৬ গ্রাম নুন অথবা ২.০ গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ নিরাপদ। ইওরোপীয় উচ্চচাপ নিয়ন্ত্রক সংস্থার (ইউরোপিয়ান সোসাইটি অভ হাইপারটেনশন) মতে, এই মাত্রা ৫ গ্রাম।[৬] যদিও উচ্চরক্তচাপের প্রাদুর্ভাব আছে এমন জনগোষ্ঠীর (৫১ বছরের বেশি বয়স, কৃষ্ণাঙ্গ, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, উচ্চরক্তচাপের রুগী অথবা অনিরাময়যোগ্য কিডনির অসুখে আক্রান্ত) নুন গ্রহণের ঊর্ধ্বসীমা দৈনিক ৪ গ্রাম (১.৫ গ্রাম সোডিয়াম)।[৭] হিসেব কষে দেখা গেছে, আমাদের নুন গ্রহণের শতকরা ৮০ শতাংশই আসে প্রক্রিয়াজাত খাবার ও পানীয় থেকে। অর্থাৎ, প্রক্রিয়াজাত খাবার ও পানীয় বর্জন অথবা সঠিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আমাদের নুন গ্রহণের পরিমাণ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আমেরিকার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই নির্দেশিকা বলবৎ করা গেলে ঐ দেশে বছরে ১,২০,০০০ জনের হৃদরোগ, ৬৬ হাজারের সেরিব্রাল স্ট্রোক, ৯৯ হাজারের হার্ট অ্যাটাক নিবারণ সম্ভব। আর তার ফলে ২৪০ কোটি ডলার সাশ্রয় করা যাবে।[৮]

খাবারে নুন মেশানো নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে উচ্চরক্তচাপের প্রাদুর্ভাব কমানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্য বেশ কিছু উপকারও পাওয়া যায়। নুন কম খেলে প্রস্রাবে কম মাত্রায় ক্যালসিয়াম বের হয়। অর্থাৎ নুন খাওয়াতে রাশ টানতে পারলে ফাউ হিসাবে পাওয়া যাবে কিডনির পাথর জমার সম্ভাবনা থেকে মুক্তি আর বৃদ্ধ বয়সে ক্যালসিয়ামে পরিপূর্ণ অধিক মজবুত হাড়। পাকস্থলির ক্যান্সার আর হাঁপানিও মাত্রাতিরিক্ত নুন গ্রহণের সঙ্গে বাড়তে থাকে।

কতটা নুন কমানো স্বাস্থ্যকর?

দৈনিক নুন গ্রহণের মাত্রা ১ গ্রামের কম (০.৪৫ গ্রাম সোডিয়াম) হলে রক্তে লঘুঘনত্বের (এলডিএল) কোলেস্টেরলের মাত্রা ১০ শতাংশ বেড়ে যায়, যদিও এটা রক্ত ঘন হয়ে যাবার জন্য হয় বলে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন।[৯] সবদিক বিচার করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন, দৈনিক নুন গ্রহণের নিম্নসীমা নিরাপদে ৪.৭ (১.৮ গ্রাম সোডিয়াম) রাখা যেতে পারে। রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা কমে যাবার ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী রেনিন-অ্যাঞ্জিওটেনসিন-এল্ডোস্টেরোন সিস্টেমের অধিক সক্রিয় হয়ে পড়ার আশঙ্কা অমূলক বলে প্রমাণিত।[১০] খেয়াল রাখতে হবে, অনিরাময়যোগ্য কিডনির অসুখে (ক্রনিক কিডনি ডিজিজ) আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রচলিত নুন অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের বিকল্প হিসাবে পটাশিয়াম সমৃদ্ধ নুনের (কম সোডিয়ামের বিকল্প নুন হিসাবে জনপ্রিয়) ব্যবহার ক্ষতিকারক। কিছু পাঠক মনে করতে পারেন, রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা স্বাস্থ্যকর সীমার নীচে নেমে গেলেও প্রাণের আশঙ্কা দেখা দেয়। একদম খাঁটি কথা। অন্যান্য কারণের সঙ্গে, বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের কিছু রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করার ওষুধে এমনটি হতে পারে। এই আলোচনা জটিল ও প্রাসঙ্গিক নয়। এটুকু জানলেই হবে, সেই আপৎকালীন অবস্থা খাদ্যে নুনের অভাবে হয় না।

আয়োডিন সমৃদ্ধ নুন কতটা অপরিহার্য

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্যাকেটে যে নুন কিনতে পাওয়া যায়, তাতে আয়োডিন থাকে। সেই নুন না গ্রহণ করলে আয়োডিনের জোগান কোথা থেকে আসবে? আয়োডিন একটি অধাতব খনিজ, যেটা

আমাদের গলার সামনে অবস্থিত থাইরয়েড নাম গ্রন্থির থাইরক্সিন হরমোন উৎপাদনের একটি কাঁচা মাল। এটির অভাবে হৃৎপিণ্ড, মাংসপেশী, স্নায়ু ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। বিশেষ করে শৈশবে মস্তিষ্কের বিকাশ অপূর্ণ থেকে যেতে পারে আর কৈশোরে দেহবৃদ্ধির সময় গলগণ্ড (গয়টার) রোগ হতে পারে। ১৯২৪ সালে প্রথম আমেরিকায় নুনে আয়োডিন মিশিয়ে গয়টার অধ্যুষিত এলাকায় সাফল্য পাওয়া যায়। যখন জানা যাচ্ছে প্যাকেটের নুনের মাধ্যমে বৃহত্তরভাবে ক্ষতিসাধন হতে চলেছে, তখন আয়োডিনের জন্য অন্য উৎস খুঁজতে হবে। জেনে রাখা দরকার, প্রক্রিয়াকৃত খাবারে যে নুন ব্যবহার হয় সেটা মোটেই আয়োডিন সমৃদ্ধ নয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক আয়োডিনের প্রয়োজন মাত্র ১৫০ মাইক্রোগ্রাম (বাড়ন্ত শিশুদের, মহিলাদের গর্ভাবস্থায় আর শিশুকে স্তন্যদানের সময় অধিক আয়োডিনের দরকার হয়)। সেটা সহজেই সামুদ্রিক মাছ, সামুদ্রিক শ্যাওলা জাতীয় খাবার অথবা লবণাক্ত আয়োডিন সমৃদ্ধ মাটিতে হওয়া সবজিতে পাওয়া যাবে। আয়োডিন সমৃদ্ধ জমিতে পালন করা গৃহপালিত পশুর দুগ্ধজাত খাবারেও পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়োডিন থাকে। সুষম, বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হলে আয়োডিনের জন্য নুনের ওপর ভরসা করতে হবে না।

খাবার সময় অবশ্য এই সব তত্ত্বকথা মাথায় থাকে না, আলাদা করে ওজন করে নুন খাওয়াটাও অসম্ভব। নুন খাওয়াতে রাশ টানার জন্য দুটি পৃথক প্রয়াস প্রয়োজন।

প্রয়াস ১ঃ নুন সমৃদ্ধ খাবার বর্জন— ক্রমবর্ধমান পশ্চিমী খাবারে অভ্যস্ত হবার কুফলে এই ধরনের খাবারই আমাদের দৈনিক অর্ধেক নুন গ্রহণের জন্য দায়ী। অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়াকরণের জন্য বেশ কিছু খাবারে প্রচুর পরিমাণে নুন থাকে। এগুলি সম্পূর্ণ বর্জনীয়। সুদীর্ঘ নুন-বিষে পূর্ণ খাবারের তালিকা থেকে অল্প কয়েকটি নাম উল্লেখ করা যাক — চটজলদি খাবার (ফাস্ট ফুড), বেকারির খাবার (কেক, পেস্ট্রি, প্যাটিস, বিস্কুট, কুকিজ, পাউরুটি), প্যাকেটজাত মাখন, চিজ, ক্যাচাপ, সস্, নোনতা খাবার (চপ, কাটলেট, নিমকি, সিঙারা), টিনবন্দী খাবার। একটি গাছ থেকে পাড়া আপেলে ১.৫ গ্রাম সোডিয়াম থাকলেও প্যাকেটজাত আপেলের রসে সোডিয়াম থাকে প্রায় ২৫ গ্রাম। প্যাকেটবন্দী খাদ্য খাবার আগে 'লেবেল গোয়েন্দা' হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। বিভিন্ন খাদ্যে নুনের মাপের অধিক তথ্য পাওয়া যাবে এই ঠিকানায়ঃ http://fcs.tamu.edu/food_and_nutrition/pdf/sodium-content-of-your-food-b1400.pdf

প্রয়াস ২ঃ দৈনিক ঘরোয়া রান্নায় নুনের নিয়ন্ত্রণ— এতে দৈনিক নুন খাওয়া এক-তৃতীয়াংশ কমানো যেতে পারে। নুনের পরিমাণ জনপ্রতি ৪ থেকে ৬ গ্রামে (চা চামচের এক চামচ) রাখতে এক হেঁসেলে পাত পাড়ে এমন সদস্যদের সংখ্যা অনুযায়ী হিসেব করে দৈনিকের বরাদ্দ করা নুন নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকা উচিত। সারাদিনের রান্না তাতেই সারতে হবে। খাবার সময় খাবারে নুন মেশানো অনুচিত। খাবারের টেবিলে (বা পাতের ধারে) নুনের শিশি, সস্ বা ক্যাচাপ (এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে নুন থাকে) থাকলে সরিয়ে ফেলতে হবে। অ্যাডভেঞ্চারে অপ্রিয় বেশ কিছু ব্যক্তির কাছে কম নুনের খাবার প্রথমে বিস্বাদ ঠেকলেও প্রথম মাসখানেক অভ্যাস করার পরে খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ পেতে অসুবিধা হবে না। আলাদা করে নুন না মিশিয়ে রান্না করলেও বেশ কিছু খাদ্যে প্রাকৃতিকভাবেই দৈনিক প্রয়োজন মেটানোর মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে সোডিয়াম থাকে। সোডিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্যগুলি হল ডিম, মাছ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার (মাখন, চিজ, দই), মাংস, পাউরুটি, পালং শাক, মূলো, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বাদাম, বিস্কুট, সরিষা, প্যাকেটজাত ফলের রস, ডায়েট কোক, আদা, রসুন, বেকিং পাউডার, সয়াসস, কাসুন্দি, ক্যাচাপ, ইস্ট ইত্যাদি।

নুন নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকাঃ (১) সুস্থ আবালবৃদ্ধবনিতার দৈনিক নুন গ্রহণের ঊর্ধ্বসীমা ৫ গ্রাম, যাতে ২ গ্রাম সোডিয়াম থাকে। (২) ৫১ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তি, কৃষ্ণাঙ্গ অথবা উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও অনিরাময়যোগ্য কিডনির অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তির দৈনিক নুন গ্রহণের ঊর্ধ্বসীমা ৪ গ্রাম (১.৫ গ্রাম সোডিয়াম)। (৩) সাদা, পরিশোধিত, মিহি ও প্যাকেটবন্দি নুনের

সোডিয়াম বেশি-থাকা খাবার এড়িয়ে চলুন

খাবারে মেশানোর নুন

চটজলদি খাবার

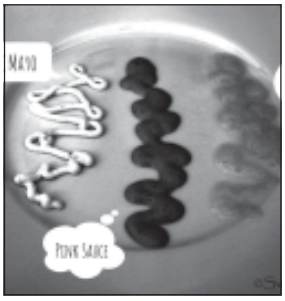

সস, ক্যাচাপ, কাসুন্দি

টিন ও প্যাকেটের প্রক্রিয়াজাত খাবার

কেক, প্যাস্ট্রি, বেক্‌ড খাবার

চিজ

সিঙাড়া

চেয়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ, অপেক্ষাকৃত অপরিশোধিত মোটা দানার লালচে নুনই (রক সল্ট) শ্রেয়।

সূত্রঋণ

1. Circulation. 1990; 81:987-995.

2. Siffert W. Dusing R. Sodium-proton exchange and primary hypertension. An update. Hypertension 1995; 26:649. 18. Kuro-o M, Hanaoka K, Hiroi Y, et al. Salt-sensitive hypertension in transgenic mice overexpressing Na (+) - proton exchanger. Circ Res 1995; 76:148.

3. Morris RC Jr, Sebastian A, Forman A, et al. Normotensive salt sensivity: effects of race and dietary potassium. Hypertension 1999; 33:18.

4. Adrogué HJ, Madias NE. Sodium and potassium in the pathogenesis of hypertension. N Engl J Med 2007; 356:1966.

5. Elliot P, Stamler J, Nichols R, et al. Intersalt revisited: further analyses of 24 hour sodium excretion and blood pressure within and across populations. Intersalt Cooperative Research Group. BMJ 1996; 312:1299

6. Mancia G, De Backer G, Dominiczak et al. 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The task force for the management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2007; 25:1105.

7. US Dept of Agriculture and US Dept Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans 2010. US Govt Printing Office; US Dept of Agriculture and US Dept Health and Human Services, Washington, DC, 2010 .

8. Coxon PG, Cook NR, Joffres M, et al. Morality benefits from US population-wide reduction in sodium consumption: projections from 3 modelling approaches. Hypertension 2013; 61:564.

9. Gradual NA, Galløe AM, Garred P. Effects of sodium restriction on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterols and triglyceride: a meta-analysis, JAMA 1998; 279:1383.

10. He J, Ogden LG, Vupputuri S, et al. Dietary sodium intake and subsequent risk of cardiovacular disease in overweight adults, JAMA 1999; 282:2027.

উমা

কলকাতার পুকুর— গরিবের জল সম্পদ, বাবুদের পরিবেশ সম্পদ

মোহিত রায়

গ্রাম পাল্টে হয় শহর। গোবিন্দপুর, সুতানুটি আর কলিকাতা গ্রাম কিনে ইংরেজরা কলকাতা শহর পত্তনের শুরু করল। দক্ষিণবঙ্গের গ্রামে বাড়ি তৈরি মানে সঙ্গে একটি পুকুর কাটাও। পুকুরের মাটি দিয়ে উঁচু করা হয় বসত ভিটা। পুকুর লেগে যায় পানের জল থেকে স্নান, কাচা, ঘর গেরস্থালির অনেক কাজে। কিছু ব্যবসার স্থল ও গ্রামের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা কলকাতার সাবেক রূপটি ছিল বাংলার গ্রামের মতনই। শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকে জানা যায়, ''... *প্রত্যেক ভবনে এক একটি কূপ ও প্রত্যেক পল্লিতে দুই-চারিটি পুষ্করিণী ছিল। এই সকল পচা দুর্গন্ধময় পুষ্করিণীতে কলিকাতা পরিপূর্ণ ছিল। অনুমান করি ... বর্তমান রাজধানীর আদিম স্থানে দুই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ভিন্ন সমগ্র স্থান ধানের ক্ষেত ছিল। শহর যেমন বাড়িয়াছে লোকে ধানের ক্ষেতে পুষ্করিণী খনন করিয়া বাস্তু ভিটা প্রস্তুত করিয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী হইয়াছে*''। কলকাতা শহরের শুরুই এক পুকুর ঘিরে, নাম তার লালদিঘী, যার বয়স এই শহরের থেকে বেশি। প্রথম ইংরেজদের ব্যবসাস্থলের পত্তন ওই লালদিঘীর পাশেই। ভাল পানীয় জল চাই তাই সাহেবরা প্রথম থেকেই সংস্কার করেছিল লালদিঘী। এরপর শহর বাড়তে শুরু করলে তার সাথে সাথে খোঁড়া হতে থাকল পুকুর, প্রতিটি বাড়ির সাথেই পুকুর, যত্রতত্র পুকুর। স্নানের জল বা পানের জল, সবই তখন পুকুরের। কলকাতার শুরুতে বেশি পুকুর হয়ে দাঁড়াল এক সমস্যা। ১৭০৭ সালের মার্চ মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ কেল্লার ফটকে এক লম্বা নোটিশ টাঙিয়ে জানাল, তাদের না জানিয়ে যেমন তেমন পুকুর কাটা চলবে না। এর কারণ বেশিরভাগ পুকুরই ছিল নোংরা, ম্যালেরিয়ার উৎস। পুকুরের তত্ত্বাবধান করা হতো কমই।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়েই নগরায়নের চাপে শহরের বেশ কিছু অঞ্চলে পুকুর কমতে শুরু করে। উত্তরে ভালো পুকুরের অভাবে হেদুয়া (বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগ)-এর বেশ নোংরা জলই ছিল তখন সে অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজের পানীয় জলের একমাত্র উৎস, সে জল খেতেন সিমলের স্বামী বিবেকানন্দ-খ্যাত দত্ত পরিবারের লোকেরা। আর তখন কাছেই জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ির লোকেরা খাচ্ছেন সরাসরি গঙ্গা থেকে আনা অশোধিত জল। যে পুকুর দেখে বালক রবির সারাদিন কাটত তাও বুজে গেছে ঠাকুরবাড়িতে। তারপর ১৮৭০-এ কলকাতায় এল কলের জল, গঙ্গার শোধিত জল— পুকুরের প্রয়োজনও কমতে শুরু করলো। গঙ্গার জল টালা ট্যাঙ্কে ভরে বাড়ি বাড়ি দেওয়া শুরু হল ১৯০৭ সালে। ১৮৮৮ সালে কলকাতায় শোধিত জল সরবরাহ শুরুর পরেও মারাঠা খালের (এখনকার মধ্য কলকাতার আচার্য জগদীশ বসু রোড ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড) ভিতর দিকেও মূল কলকাতায় হাজার হাজার পুকুর ছিল আর তখনকার ভবানীপুরেই ছিল ৮২৩টি পুকুর, জানাচ্ছেন প্রখ্যাত কলকাতা-গবেষক শ্রী পি থানকাপ্পন নায়ার।

আহিরিপুকুর, শ্যামপুকুর, ঝামাপুকুর, বেনিয়াপুকুর, ফড়িয়াপুকুর, পদ্মপুকুর, কাঁটাপুকুর, নোনাপুকুর, হাঁসপুকুর, জোড়াপুকুর, মনোহরপুকুর, মুরারীপুকুর— এসবই উত্তর ও মধ্য কলকাতার স্থান নাম। এত পুকুরের কলকাতার উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে কিন্তু একশ বছরের মধ্যেই পুকুর প্রায় শেষ হয়ে গেল। ওয়ার্ড ৭ থেকে ওয়ার্ড ১২ বনেদী উত্তর কলকাতা ধরলে তাতে আর বি স্মার্ট সাহেবের সমীক্ষায় ১৯১১ সালে ছিল ৪৭টি পুকুর, পঞ্চাশ বছর পর ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের সমীক্ষায় ১৯৬১ সালেই তা কমে দাঁড়িয়েছে সবেধন একটিতে। বাগবাজার শোভাবাজর শ্যামবাজার বড়বাজার নিয়ে বনেদী উত্তর কলকাতাতে পুকুর বলতে একটিই— প্রাচীন হেদুয়া। কলকাতার ওয়ার্ড সংখ্যা ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩ নিয়ে ভবানীপুর ধরলে ১৯১৪ সালের সমীক্ষার মানচিত্রে পুকুর গুণে পাওয়া যাচ্ছে ৫০৫টি পুকুর। আর তার পঞ্চাশ বছর পর ১৯৬১ সালের ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের গবেষণার মানচিত্রে পাওয়া যাচ্ছে ৩৩টি পুকুর। তার পঞ্চান্ন বছর পর ২০০৬ সালে পুরসভার

হিসেবে সেখানে একটিও পুকুর নেই। মনোহরপুকুর নামে ৮৪ নং ওয়ার্ডে পুকুর নেই একটিও। ভবানীপুর, কালীঘাট, বালিগঞ্জ— এই খোদ বনেদি দক্ষিণ কলকাতায় পুকুর বলতে একটিই— দুশ বছরেরও পুরনো পদ্মপুকুর।

তাহলে কি পুকুরের কোনো দরকার আছে? পুকুর ছাড়াই তো চলছে পুরনো কলকাতা। চলছে কিন্তু কেমন চলছে? যে ক'টি হাতে গোনা পুকুর আছে সেখানে গিয়ে কি দেখা যাবে? হেদুয়া, লালদিঘী, পদ্মপুকুর, গোলদিঘী (কলেজ স্কোয়ার), গোলতলা পুকুর (হাজী মহম্মদ মহসীন স্কোয়ার)-এ গেলে দেখা যাবে সাধারণ দরিদ্র মানুষ স্নান করছেন, কাপড় কাচছেন। মাঝে মাঝে পুর কর্তৃপক্ষ এসব বন্ধের প্রচেষ্টা চালায়, একটু শিথিল হলেই আবার স্নান কাপড় কাচা শুরু হয়ে যায়। যেহেতু ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জলের ব্যবস্থার ভার সরকারি কর্তৃপক্ষ নিয়েছিল ফলে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পুকুরগুলির কথা তারা মনে রাখে নি। শুধু ছোট পুকুর নয়, ব্যক্তি মালিকানাধীন বড় পুকুরগুলি যা শত শত মানুষ ব্যবহার করত তা সবই ভরাট হয়ে গেছে। পুকুরের অভাবে উত্তর ও মধ্য কলকাতার হাজার হাজার গরিব সাধারণ নরনারী কোনো আব্রু ছাড়াই একেবারে বড় রাস্তায় পুরসভার জলের কলে বা পুরসভার একদা রাস্তা ধোয়ার জন্য গঙ্গার জলের মোটা পাইপের ধারায় স্নান কাপড় কাচা সবই করেন। ফলে জল নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি, হুড়োহুড়ি, বচসা রোজকার ব্যাপার। মেয়েদের জন্য এই রাজপথে গণস্নান অস্বস্তিকর তো বটেই। একটি আধুনিক মহানগরীতে এরকম দৃশ্য উত্তর কলকাতাবাসীর চোখ সয়ে গেছে। কিন্তু কলকাতার দক্ষিণে, একেবারে উত্তরে, পূর্বে এখনো আছে কয়েক হাজার পুকুর। সেখানে এই রাজপথে গণস্নান তেমন চোখে পড়বে না। বরং দক্ষিণ বা পূর্ব কলকাতার পুকুরের ঘাট যেন এক স্বস্তির অবকাশ। সেখানে পুকুরে স্নান একটি সামাজিক যোগাযোগ, কখনও কিছুটা অবসর বিনোদন।

কলকাতার পুকুরে কী হয়?

কলকাতার প্রায় হাজার পাঁচেক পুকুরে কি হয়? খুব ছোট পুকুরগুলির সরাসরি মানুষের কাজে ব্যবহার কম হলেও বাকি কয়েক হাজার মাঝারি ও বড় পুকুর ব্যবহার করেন প্রচুর মানুষ। প্রায় একশো পুকুরে নমুনা সমীক্ষা চালিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছি যে, কলকাতা পুরসভা অঞ্চলের পুকুরগুলির ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ১০ লক্ষের মতো। পুকুরের প্রত্যক্ষ ব্যবহারের ধরণগুলি হল— ১) স্নান,২) হাত-মুখ ধোওয়া, ৩) কাপড় কাচা, ৪) বাসন মাজা, ৫) তরকারি, মাছ ধোওয়া, ৬) বাড়ি তৈরি, দোকানের জল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রয়োজন, ৭) রান্নার জল, ৮) গরু মোষ স্নান করানো, ৯) গাড়ি, বাস, মোটর সাইকেল ধোওয়া, ১০) বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে পুকুরের জল ব্যবহার, তর্পণ ইত্যাদি, ১১) প্রতিমা বিসর্জন, ১২) মাছ চাষ, ১৩) ছিপ দিয়ে মাছ ধরা।

এইসবগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি হল ১) স্নান ২) কাপড় কাচা ৩) মাছ চাষ। পুকুরের ব্যবহারকারীদের ৮৫ শতাংশ হচ্ছেন স্নানার্থী। মনে রাখতে হবে যে আমাদের গরম দেশে স্নান জনস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের সমীক্ষা দেখিয়েছে যে পুকুরে স্নান করেন তাঁদের ৮০ শতাংশ গরিব মানুষ। তার কারণ গরিবদের বাড়িতে পুরসভার জল ব্যবহারের সুবিধা এখনও নেই। কলকাতার বাকি অঞ্চলে যেখানেই পুকুর আছে সেখানে গরীব মানুষেরা পুকুর ব্যবহার করেন। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী কলকাতার জনসংখ্যার ৬ শতাংশ তফসিলি জাতি অথচ তফসিলি স্নানার্থীদের সংখ্যা পাঁচ গুণ, ৩০ শতাংশ। এতে তফসিলি জাতির জনসাধারণ যে জল সরবরাহের মতো নাগরিক সুবিধা কম পান ও তাঁদের তুলনামূলক দারিদ্র্যই আরো প্রকট হয়। কলকাতা শহরের পুকুর তাই গরীবের জল সম্পদ।

কলকাতার জেলে

নাগরিক জীবনের বর্ণনায় কখনো কোনো জেলের জীবন স্থান পায় না অথচ এই পাঁচ হাজারি পুকুরের কলকাতা শহরে অন্তত হাজার দুয়েক জেলে রয়েছেন যাঁর শুধু মাছ ধরেই জীবন চালান। জেলেদের কাজ করতে হয় একটি দল হিসেবে সেজন্য কলকাতার এই জেলেরা থাকেন নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে। এরকম জেলে গোষ্ঠীরা আছেন দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার বড়িশা ও সরসুনায়, দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জে, দক্ষিণ-পূর্বের গড়ফা ও বালিগঞ্জে, পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটায়। একেবারে উত্তর প্রান্তেও বেশ কিছু পুকুর থাকায় সেখানেও জেলে গোষ্ঠী থাকাই স্বাভাবিক। এই জেলেদের বেশ কিছু জন এসেছেন প্রতিবেশী রাজ্য উড়িশা থেকে। বেহালা ও সরসুনায় কয়েকটি জেলেদের সমবায় রয়েছে, যেমন— বেহালা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, সরসুনা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, ঝাউতলা রায়দিঘী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ইত্যাদি। কলকাতার দক্ষিণ পশ্চিমে জলাভূমি পরিচালনা করে মুদিয়ালি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। একেবারে দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে ৬০ জনের সমবায় পাটুলি মৎস্যজীবী সমিতি। এঁরা কয়েকটি বড় পুকুরে মাছ ধরেন। এছাড়াও পূর্ব কলকাতার জলাভূমি অঞ্চলে রয়েছে কয়েকটি সমবায় সমিতি যেমন— নলবন সমবায় সমিতি, ক্যাপ্টেন ভেড়ি সমবায় সমিতি, পূর্ব কলকাতা মৎস্যজীবী সমিতি ইত্যাদি।

এই সমিতিগুলি রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের নিবন্ধীকৃত। এই সমিতির মৎস্যজীবীদের সচিত্র পরিচয়পত্র থাকে। কলকাতার পুকুর এই শ্রমজীবী মানুষগুলির অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্র।

যাঁরা পুকুরে স্নান করেন না তাঁদেরও প্রয়োজন পুকুর

কলকাতা একটি ঘনবসতির শহর। ২০১১ সালে কলকাতার জনঘনত্ব ছিল ২৪২৫২ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে। এই শহরে খোলা জায়গার অত্যন্ত অভাব। কলকাতার কেন্দ্রের ময়দানকে বাদ দিলে কলকাতার প্রথম ১০০টি ওয়ার্ডে কিছু ছোট ছোট সবুজ ক্ষেত্র বা পার্ক আছে মাত্র। ১৯৮৪-তে অন্তর্ভুক্ত বাকি ৪১টি ওয়ার্ডে পার্ক বলে প্রায় কিছু নেই। সব খালি জায়গাই অপেক্ষা করছে বাড়িঘর তৈরি হবার জন্য। কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়াই বিস্তৃত হয়ে গেল কলকাতা। এটি বামপন্থী সরকারের অবদান। ফলে কলকাতার খোলা জায়গার অভাব অনেকটাই মেটাচ্ছে এই হাজার কয়েক পুকুর। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বাঁচানোর মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়দানের পর কলকাতার পুকুর বাঁচানোর জনআন্দোলন শক্তিশালী হল। সরকার ১৯৯৩ সালে ৫ কাঠার বেশি আয়তনের পুকুর বোজানো বেআইনি ঘোষণা করে আইন করলেন। ফলে পুকুর বাঁচানোর কাজ অনেকটা এগোলো। পুকুর মানে অনেকটা খোলা জায়গা, জল, কিছুটা মুক্ত হাওয়া। ফলে অবস্থাপন্ন নাগরিকেরা যাঁরা নোংরা পুকুরে স্নান করেন না, তাঁরা তাঁদের বসতি অঞ্চলের পরিবেশ উন্নয়নে পুকুর বাঁচাতে এগিয়ে এলেন। কলকাতার পুকুর বাঁচানোর আন্দোলন মূলত ভদ্রলোকদের নিজেদের চারপাশের পরিবেশ উন্নয়নের আন্দোলন। এঁরা গরিব মানুষের পুকুরে স্নান-টান একেবারেই চান না। এজন্য এক খ্যাতনামা পরিবেশবাদী গরিব মানুষেরা যাতে রবীন্দ্রসরোবরে স্নান না করতে পারে সেজন্য মামলা করে সরোবরের কাছ থেকে তাঁদের ভিটেমাটি উচ্ছদ করে ছাড়েন। আমাদের সমীক্ষায় দেখেছি যে প্রায় সব পুকুরের (৯৫ শতাংশ) পাশেই কিছু গাছপালা থাকে, ২০ শতাংশের পাশে আছে বাগান। প্রায় ৬০ শতাংশ পুকুরের পাশে আছে আড্ডা মারার বেঞ্চ। এসব গাছপালা, ঝোপঝাড়, পুকুরের পাড়ে থাকে অনেক ধরনের পাখি, সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ, অনেক ধরনের গুল্মলতা। ফলে শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ (ইকোলজি)-এর জন্য পুকুরের অস্তিত্ব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি খোলা ও অপেক্ষাকৃত মনোরম আবহাওয়ার জন্য পুকুরকে ঘিরে শহরের মানুষেরা আড্ডা ও অন্যান্য বিনোদনে ব্যবহার করেন। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ঢক্কানিনাদে মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে এই পুকুরগুলি স্থানীয় আবহাওয়াকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে, কিছুটা শীতল রাখে। কলকাতার শিক্ষিত মানুষেরা এখন পরিবেশ দূষণ নিয়ে কিছুটা সচেতন, ফলে একটি মেগাসিটিতেও যে ছোট ছোট পুকুর খুব গুরুত্বপূর্ণ— সে ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

তাহলে পুকুর বুজছে কেন?

পুকুর যে একটা সম্পদ, এটা কলকাতার পরিকল্পনাকারদের চিন্তায় কখনো আসেনি। এখনো নয়। কলকাতা পুরসভার কাছে কলকাতার পুকুরের কোনো তালিকাই ছিল না। এখনো কোনো ঠিক তালিকা নেই। নেই সেগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য। কলকাতার জন্য যতগুলি পরিকল্পনা গত ৫০ বছরে তৈরি হয়েছে তাতে পুকুরের অস্তিত্ব পর্যন্ত উল্লেখ নেই। কলকাতা পুরসভার শ'দেড়েক পার্কের জন্য আলাদা দপ্তর আছে, কয়েক হাজার পুকুরের জন্য কিছু নেই। আমাদের শহরের পরিকল্পনাবিদ, প্রযুক্তিবিদ এঁরাও কিছু জানেন না। কারণ হচ্ছে গরিব মানুষের ব্যাপার, তা নিয়ে শিক্ষিত মানুষেরা মাথা ঘামাবেন কেন? গত শতাব্দীর শেষ তিন দশকে পুকুর বোজানো এক ব্যাপক শিল্প হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ অবশ্য দ্রুত অপরিকল্পিত নগরায়ন। কলকাতায় জমির অভাবে পুকুর বোজানোটাই স্বাভাবিক। গত দু'দশকে পুকুরের সঙ্গে পরিবেশ যুক্ত হওয়ায় পুকুর বোজানোর বিরুদ্ধে বেশ কিছু জন-আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু নগরায়নের চাপ, নির্মাণ শিল্পে ব্যাপক মাফিয়ার প্রবেশ, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মাফিয়াদের পৃষ্ঠপোষকতা— সব মিলিয়ে পুকুর বোজানো চলছেই।

কলকাতায় পুকুরের একটি তালিকা কলকাতা পুরসভা ২০০৬ সালে তৈরি করে। যদিও এটি যে একেবারে সঠিক তা একেবারেই নয়। এতে মোট পুকুরের সংখ্যা ছিল ৩৮৭৪। ভারত সরকারের সংস্থা ন্যাশনাল অ্যাটলাস অ্যান্ড থিমাটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন (ন্যাটমো) ২০০৬ সালে কলকাতা শহরের একটি বিশদ মানচিত্র ১ঞ্জ৫০০০ মাপে প্রকাশ করেছে। এই বইটিতে ২৮৪টি মানচিত্রে কলকাতা পুরসভার ১৪১টি ওয়ার্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানচিত্রের পুকুরগুলিকে গুণে ১৪১টি ওয়ার্ডে ৮৭৩১টি পুকুর পাওয়া যায়। আমরা গুগল উপগ্রহ চিত্রে কলকাতার মানচিত্র বসিয়ে পুকুর গুনে পেয়েছিলাম ৪৮৮৯টি। এতেও কিছু ভুলচুক হওয়াই স্বাভাবিক।

কলকাতার ১৪১টি ওয়ার্ডের পুকুরের সংখ্যা

সাল ও সমীক্ষা	২০০৬ কলকাতা পুরসভা	২০০৬ ন্যাটমো-র মানচিত্র	২০০৭ গুগল উপগ্রহ চিত্র
পুকুরের সংখ্যা	৩৮৭৪	৮৭৩১	৪৮৮৯

কলকাতা পুরসভার তালিকা ও ন্যাটমোর মানচিত্র তুলনা করে কলকাতার কোন অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক পুকুর বোজানো হয়েছে ও হচ্ছে তা কিছুটা বোঝা যাবে। কলকাতার দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে কালিকাপুর, হুসেনপুর, গরফা, রাজডাঙ্গা অঞ্চলে, পূর্বে ধাপা, ট্যাংরা অঞ্চলে, একেবারে পশ্চিমে গার্ডেনরিচ মেটিয়াবুরুজে, দক্ষিণে ব্রহ্মপুর, পশ্চিম পুটিয়ারি অঞ্চলে বেশি পুকুর বোজানো হয়েছে। কালিকাপুর, হুসেনপুর অঞ্চলে পুকুর জলা বুজিয়ে অনেক নতুন নতুন বিত্তশালীদের জন্য আবাসন প্রকল্প তৈরি হয়ে গেছে।

কোথায় বেশি পুকুর বোজানো হয়েছে

ওয়ার্ড	২০০৬ কলকাতা পুরসভা	২০০৬ ন্যাটমো-র মানচিত্র	২০০৬-এ ন্যাটমো-র কত পুকুর নিখোঁজ	কলকাতার কোন অঞ্চল
১০৯	৪০	৭৮০	৭৪০	ছিট কালিকাপুর /মুকুন্দপুর
১০৮	৫৬	৫২৮	৪৭২	হুসেনপুর
১০৬	৫৬	৪২৫	৩৬৯	গরফা-হালতু
১০৭	১৪	৩৬৪	৩৫০	রাজডাঙ্গা-নস্করহাট
১২২	৭	৩২৬	৩১৯	পশ্চিম পুটিয়ারি
১২৪	৫৭	৩৪৯	২৯২	পশ্চিম বড়িশা
১৪০	২১৭	৪৫২	২৩৫	মেটিয়াবুরুজ
৫৭	৩৯	২৭১	২৩২	ট্যাংরা
৫৮	৭৪	৩০৪	২৩০	ধাপা
১৪১	২৬৯	৪৮৩	২১৪	মেটিয়াবুরুজ
১৩৯	২১৮	৪২০	২০২	গার্ডেনরিচ
১১১	২৬	১৬৪	১৩৮	ব্রহ্মপুর
১১৪	৩	১৩৭	১৩৪	পশ্চিম পুটিয়ারি
১২৩	৭৫	১৮৮	১১৩	পূর্ব বড়িশা
৫৯	৩৭	১৩৮	১০১	ট্যাংরা-গোবরা

এখন কিছু পুকুর উন্নয়নের কাজ হচ্ছে কিন্তু সেই উন্নয়নের মানে হচ্ছে পুকুরের সৌন্দর্যায়ন, আরো বিজলি আলো, জলের মধ্যে ফোয়ারা, দুপাশে বাগান, বাঁধানো পথ ইত্যাদি। কিন্তু জলের মান, স্নানের ভাল ঘাট, কাপড় কাচার বিকল্প ব্যবস্থা — এসব কিসসু হচ্ছে না। কলকাতার পুকুর বাঁচবে। তবে কাদের জন্য বাঁচবে তা নিশ্চিত নয়।

তথ্যসূত্র ও বিশদে জানবার জন্য পড়ুন -

কলিকাতা পুকুরকথা- *পরিবেশ ইতিহাস সমাজ* ঃ মোহিত রায়। আনন্দ,২০১৩।

উমা

প্রয়াত খোকনদা

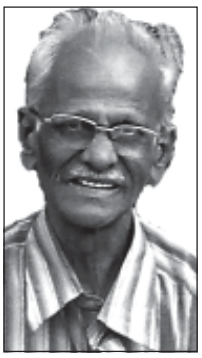

তখন রাত ১০টা। মোবাইলে মেসেজ এল খোকনদা মারা গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই মনটা বিষাদে ভরে গেল। পুরনো কথা ভিড় করতে থাকল মনে। সেই ১৯৭৫, জরুরি অবস্থার দাপটে সব চুপচাপ, কোথাও কিছু দানা বাঁধানো যাচ্ছে না। আমরা কয়েকজন ছেলেমেয়ে বালি মিলের অস্থায়ী শ্রমিক বস্তির ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে রাতের স্কুল চালানো শুরু করলাম। সেখানেই একদিন সন্ধ্যেবেলা দেবীদার সঙ্গে হাজির এক ভদ্রলোক, বেশ কয়েকটি কিশলয় বই সঙ্গে নিয়ে। দেবীদা পরিচয় করালেন– এঁর নাম খোকন, ভাল নাম প্রদীপ চ্যাটার্জি। প্রথম আলাপেই নিকটজন। কথা শুরু করলেন তুই দিয়ে। তারপর কলকাতায় যখনই কোনো মিটিংয়ে এসেছি অথবা মিছিলে হেঁটেছি, দেখা হয়েছে খোকনদার সঙ্গে। এগিয়ে এসে একগাল হেসে কথা বলেছেন, খবরাখবর নিয়েছেন। কাজ করছি না বলে গালমন্দও দিয়েছেন। ১৯৮১-৮২ সাল নাগাদ 'উৎস মানুষ'-এর তৎকালীন ঠেক নিবারণদার ঘরে আবার খোকনদার সঙ্গে নতুন করে দেখা। মনে পড়ছে, অশোকের সঙ্গে ছোটখাটো কথার খোঁচাখুঁচি, কেউই কাউকে ছাড়ছে না, হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা চলেছে কোনোদিন। তারপর কেটে গিয়েছে অনেকগুলো দিন। সেইভাবে আর যোগাযোগ ছিল না। তবে বইমেলায় দেখা হলেই সেই পুরনো হাসি আর কথা। নিপীড়িত মানুষের পাশে খোকনদা থাকলেন সারা জীবন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মিছিল-মিটিংই হোক বা বস্তি-উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মিছিল-- সব জায়গাতেই সক্রিয় ছিলেন এপিডিআর-এর সক্রিয় কর্মী খোকনদা। সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর পাশাপাশি শেষের দিকে তাঁকে লড়াই করতে হল দুরারোগ্য ক্যান্সারের বিরুদ্ধে। লড়তে লড়তে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এই আজীবন যোদ্ধা। তাই ৬৭ বছর বয়সে এসে থেমে যেতে হল। আমাদের সাধ্যমতো লড়াই জারি রাখব, এই অঙ্গীকারের মধ্যে দিয়েই তোমাকে বিদায় জানাই খোকনদা।

পূরবী ঘোষ

উমা

মধুর সন্ধানে কটি চরিত্র

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জল আর জঙ্গল নিয়ে সুন্দরবন। পৃথিবীর বৃহত্তম বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ অঞ্চল। দেশবিভাগ সুন্দরবনকে দু টুকরো করে দিয়ে গেছে। বেশিরভাগটাই পড়েছে এখনকার বাঙলাদেশে, বাকিটা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আওতায়। অজস্র ছোটবড় নদী আমাদের সুন্দরবনকে টুকরো টুকরো করে কেটেছে, তৈরি করেছে ১০২টি দ্বীপ। তার মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে বন কেটে বসত গড়েছে মানুষ, বাকি ৪৮টি দ্বীপে গহন অরণ্য। সেখানে জল আর জঙ্গলের নিবিড় নৈকট্য, প্রকৃতির অবাধ লীলাক্ষেত্র। জীববৈচিত্র্য ও অসংখ্য পাখপাখালির অদ্ভুত সমাহার। নদী-আকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল সেই দুর্গম গহন অরণ্যে ভয়কে তুচ্ছ করে পেটের তাগিদে ঢুকতে হয় মউলে-বাউলেদের। উদ্দেশ্য মধু সংগ্রহ। দারিদ্র্যজর্জর সেই মউলে-বাউলেদের নিয়েই এই নিবন্ধ, যাঁদের ওপর মিডিয়ার আলো পড়ে না।

ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমির এই নিয়েই মউলে-বাউলেদের প্রত্যাহিক জীবন। বাঘের গর্জন, বিষাক্ত সাপের ছোবল, কুমির-কামটের লোলুপ দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে তাঁদের লোকালয়ের দ্বীপ থেকে ডিঙি বা নৌকো নিয়ে মধুমাসে দরিয়ায় ভাসতে হয় সেই গভীর বনের উদ্দেশে। মাঘ-ফাধন-চৈত্র— এই ক'মাস মধুমাস, ঘন জঙ্গলের গাছে গাছে ফোটে অজস্র ফুল। ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি সে সময় ফুল থেকে মধুচয়ন করে জমা করে তাদের মৌচাকে। সেই মৌচাক ভেঙে মধু সংগ্রহই মউলেদের কাজ।

ছ-সাত জনের একটি দল, তাদের মধ্যে একজন গুরু বা গুনিন থাকে, সে হল বাউলে, অন্যরা হল মউলে। বাউলেদের মূল কাজ নিরাপত্তার জন্য মন্ত্র পড়া। ১০ বছর মউলের কাজে অভিজ্ঞ হলে তবেই তিনি বাউলে হতে পারেন। বাউলে দলের কাছে খুব সম্মান আদায় করেন। তাঁর নির্দেশ ছাড়া কাজ হয় না অর্থাৎ টিম লিডার বা ক্যাপ্টেন। নানা ছড়া, মন্ত্র তাঁদের শিখতে হয় এবং ভালমতো মুখস্থ রাখতে হয়। এক এক মন্ত্রের এক এক কাজ। কোনোটা দেহশুদ্ধির, কোনোটা হিংস্র বাঘকে স্তব্ধ করার জন্য, কোনোটা বাঘকে দূরের জঙ্গলে তাড়িয়ে দেবার জন্য, বা কোনও হিংস্র জন্তু জানোয়ার আশেপাশে না থাকে তার জন্য। ওই সব মন্ত্রে খুব ভাল কাজ হয় বলে ওঁদের বিশ্বাস। বাউলেদের কয়েকটি ছড়ামন্ত্রের নমুনা। বাঘ তাড়াবার মন্ত্র—

ইন্দুর বান্দর অনেক সাপ
জলে কুমির বনে বাঘ,
আরও বন্ধন গাড়াল সাপ
সাপেরা হল পাঁচ ভাই—
পথ ছেড়ে দাও রথে যাই।

বাঘের মুখ বন্ধ করার মন্ত্র—

আপনি মা পীরজঙ্গলি হাতে লিয়ে লাঠি
আমার সাথে এসো আপনি দয়াল বেটি,
যে নড়ে যে চড়ে যে কাড়ে রা
পীরজঙ্গলি তালাক লাগে বাঘ না করে হাঁ।

জঙ্গলে যাত্রাকালে নিরাপত্তা মন্ত্র—

আমার আগে আল্লা পাছে নবি ডাইনে সমাদ্দার
বামে ফতেমা বিবি সামনে মালেক কূল
আল্লার চাল, খোদার খাঁড়া আলার পাঁচপ্রহর
দোহাই আল্লা, দোহাই আল্লা, দোহাই আল্লা।

বনযাত্রার ডিঙি ছাড়তে শুভদিন দেখা অবশ্যকর্তব্য। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী ও শুক্রবার যাত্রা নাস্তি। ডিঙি ছাড়ার আগে ভক্তি সহকারে বনবিবির পুজো করা হয়। বাতাসা, খই, আখ, ছোলা ও ফুল দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়া, তারপর বদর-বদর করে ডিঙি ভাসানো। সঙ্গে নিয়ে নেয় দিনসাতেকের রসদ। চাল, ডাল, সবজি, মশলা, পানীয় জল, শুকনো কাঠ, উনুন, বিড়ি, দেশলাই, পান, সুপারি, দোক্তা ইত্যাদি। সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য দা, কুড়ুল, বল্লম, শক্ত লাঠি। আর সঙ্গে যায় বড় প্লাস্টিকের জার ও বোতল মধু ভরে আনার জন্য। অরণ্য যাত্রার তোড়জোড় কম নয়।

মউলে-বাউলেরা অঞ্চলের ভূমিপুত্র, তথাকথিত নিম্নবর্গেরই মানুষ। পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র, জেলে, বাগদি, আদিবাসী ও মুসলমান সম্প্রদায়। দারিদ্র্য তাঁদের সর্বাঙ্গে। ক্ষুধার তাড়নায় তাঁদের বেরোতে হয় এই বিপজ্জনক অভিযানে। অবশ্য অরণ্যের দুর্বার আকর্ষণও তাঁদের কিছুটা তাড়িয়ে বেড়ায়। মূলত চাষবাসই এঁদের জীবিকা। সুন্দরবনের নোনা মাটিতে অধিকাংশই একফসলী জমি— ধানচাষই আসল। তাছাড়া লঙ্কা, তরমুজ ও কুমড়োর চাষও হয়। নদীর মীন, কাঁকড়াও অনেক মানুষের জীবিকা। এই

মউলে-বাউলেদের দুটো দল আছে এই তল্লাটে। একদলের সরকারি পাস থাকে, তাঁরা বিনা বাধায় মধুসংগ্রহ করতে পারেন, অন্য কিছু দল আছে, সরকারি পাস থাকে না। বাঘ ছাড়াও এঁদের দুশ্চিন্তা কখন বনবিভাগের জলে টহলদেওয়া লোকেরা ধরবে। ধরলে কড়া শাস্তি বা দিতে হয় মোটা টাকার ঘুষ। এমনও হয় বনবিভাগের কর্মীদের ভয়ে চোরা মধুশিকারীরা সারারাত গাছের ডালে কাটিয়ে দেন। বড় দুঃসহ সে সময়।

কাজের সময় মধুসংগ্রাহক মউলেদের আচার আচরণ খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ। কাছা দিয়ে কাপড় পরতে হবে, লুঙ্গির মতো নয়। মন্ত্র শোনার পর ডিঙি থেকে ডাঙায় পা দিয়েই তাঁরা নদীর নোনা জল একটু মাথায় ছিটিয়ে নেন। বনের মাটি কপালে ঠেকান তারপর বনবিবিকে স্মরণ করতে করতে সরঞ্জাম নিয়ে বনে ঢোকেন। জঙ্গলের মাটিতে মলমূত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। বেগ এলে বনের গাছের পাতা বিছিয়ে তবে করতে হয়। এ নিয়মভঙ্গ হলে সর্দার বাউলের কানে গেলে শুনতে হয় অশ্রাব্য গালাগাল, কখনও চড়থাপ্পড়। অরণ্যে কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ওঁরা জোরে 'কু' দেন, দলের অন্যরা তখন তাঁর অনুসন্ধানে বেরোন।

অরণ্যবিধৃত সুন্দরবনে যেমন অসংখ্য গাছগাছালি তেমনই এই মধুমাসে ফোটে অজস্র ফুল। এক এক বনে এক এক গাছের আধিক্য। ফুলের গন্ধে আকাশ বাতাস ম ম করে। নদীর কিনারায় কেওড়া বাইন ও তাদের উৎকীর্ণ শ্বাসমূল আর গহন বনে সুন্দরী, হেঁতাল, খলসে, গর্জন গাছের সমারোহ। মধুমাসে অজস্র মৌমাছির গুঞ্জন, গাছের ডালে বড় বড় মৌচাক। সুন্দরবনের মৌমাছিরা আকারে বড়, গায়ের রং স্বর্ণাভ। এরা ঝাঁক বেঁধে লক্ষ লক্ষ ফুলে ঘুরে বেড়ায় গুনগুনিয়ে। ফাগুন মাসে খলসে গাছের ফুলে প্রচুর মধু পাওয়া যায়। খলসে মধু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু। দেখতেও চমৎকার। যেন হালকা গলানো সোনা। এই মধুর দামই বাজারে সবচেয়ে বেশি। মউলেরা দেখে ও আঘ্রাণে বুঝতে পারেন কোনটা খলসে মধুর মৌচাক। বাইন, গরান, গর্জনের ফুলের মধু সংগ্রহ করা হয় তবে তা তত উৎকৃষ্ট নয়। স্বাদ বর্ণ গন্ধে কিছু নিরেস। খাঁটি মধুর ভেষজ গুণ প্রচুর। অনেকেই হয়ত জানেন মধু এত মিষ্টি কিন্তু এটা মানুষের ব্লাড সুগার বাড়ায় না। অর্থবান মানুষ যাঁরা তাঁদের শহরের ডাইনিং রুমে বসে মধু সেবন করেন তাঁরা কেউ খোঁজই রাখেন না এই মধু সংগ্রহ করা মউলেদের দুর্দশার কথা, তাদের পরিশ্রমের আর ঝুঁকির কথা।

মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে সুন্দরবনে বাঘের পেটে যাবার ঘটনা বিস্তর। শ্বাপদসংকুল গভীর গহন বনে আঁতিপাঁতি খুঁজে মৌচাকের সন্ধান পেয়ে খুব সাবধানে মউলেদের মৌচাক ভাঙতে হয়। শুকনো লতাপাতা জ্বালিয়ে ধোঁয়া দিলে মৌমাছি সব উড়ে পালায়, তখনই হয় চাকভাঙার কাজ। খুশিয়াল মউলেরা চাক ভাঙতে ভাঙতেই ওঁৎ পাতা ধূর্ত বাঘের আক্রমণে পড়ে যান অনেক সময়। রয়েল বেঙ্গলের সুতীক্ষ্ণ দাঁত আর নখের আঘাতে প্রাণ হারাতে হয় বেঘোরে। কথায় আছে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। বাঘের সামনে-পিছনে চারটে সবল পায়ে থাকে আঠারোটা সুতীক্ষ্ণ নখ, যা শিকারকে ক্ষতবিক্ষত করে। বাঘকে বাধা দেবার চেষ্টায় ব্যর্থ হলে মউলেরা নিরাপদ দূরত্বে পালান। গুনিনের মন্ত্র কী কাজ করল ভাবার সময় পান না। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। আদিবাসী মউলেরা শেষ পর্যন্ত এককাট্টা হয়ে লড়ে সঙ্গীকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন।

নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবনের গোসাবা, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, বাসন্তীর বুক চিরে বয়ে গেছে বহু নদী। মাতলা, রায়মঙ্গল, কালিন্দী, বিদ্যাধরী, গাঁড়াল, ঠাকুরান আপন মনে বয়ে যায়। দুপাশে ঘন অরণ্য। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে তাদের নিত্যকার তরঙ্গভঙ্গ। অনেক ছোট নদীই ক্রমে মজে শীর্ণকায়। বেশ কিছু ছোট নদী লুপ্তই হয়ে গেছে। সেখানে জেগে উঠেছে চর।

সুন্দরবনের এখন এককথায় কোণঠাসা অবস্থা। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পাওয়া সত্ত্বেও অনুন্নয়ন ও পরিবেশগত কারণে তার আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। শত শত টন পলি জমা হয়ে শিরা উপশিরার মতো নদীগুলোর সেই কুলকুল প্রবাহ আর নেই। উষ্ণায়নের কারণে সেখানের আবহাওয়া খামখেয়ালি, দুরন্ত ঝড়ঝঞ্ঝা লেগেই আছে। আয়লার মতো কালান্তক ঝড় সুন্দরবনের বুকে শক্তিশেল হেনেছে। প্লাবনের নোনা জল বিস্তীর্ণ জমিকে পঙ্গু করে দিয়ে গেছে। হতভাগ্য ভূমিপুত্র মউলে-বাউলেদের সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে। অনেকে পেটের দায়ে পাড়ি দিয়েছেন চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, আন্দামানে।

শীতকালে শহুরে বাবুরা বিলাসবহুল লঞ্চে প্রমোদভ্রমণে যান সুন্দরবনে। তাঁদের শুধু বাঘ দেখার কৌতূহল। উত্তম আহারের পর দামি ক্যামেরায় লুক থ্রু। সুন্দরবনের সৌন্দর্য উপভোগ। সুন্দরবন নিয়ে ভাবনার কোনও তাগিদ তাঁদের নেই। নিদারুণ দারিদ্র্যজর্জর মউলে-বাউলেদের জলজঙ্গলের বাসভূমি যে তিমিরে ছিল আজও প্রায় সেই তিমিরেই। বরং ভবিষ্যতের তমিস্রা যেন আরও ঘন হয়েছে। পরিবেশবিদরা বলছেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে সমুদ্রে জলস্তর বৃদ্ধিতে সুন্দরবন একদিন জলের তলায় চলে যাবে, তার বেশি দেরি নেই। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপুষ্টি, ঝাড়ফুঁক, মন্তর-তন্তরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মউলে-বাউলেরা আজও বড় অসহায়, সত্যিকারের উন্নয়নের আলো থেকে বহু দূরে। উমা

কলকাতা বইমেলা কেমন হল

গড়ের মাঠের বইমেলা আজ শুধুই স্মৃতি! বইমেলা আগের কৌলীন্য হারিয়ে আর পাঁচটা মেলার দলে ভিড়ে গেছে। বইপ্রেমী পাঠক কি সত্যিই কমে গেছে! মনে তো হয় না। তা হলে বইয়ের বিক্রি বাড়ছে কী করে? জেলায় জেলায় বইমেলা, অনলাইনে বই কেনার সুযোগ হাতের কাছে পেয়ে গেলে কে আর বাইপাশের ধারে মিলনমেলার মাঠে আসতে চায়? বিশেষ করে হাওড়া বা শিয়ালদা স্টেশন দিয়ে যাদের আসতে হয় তাদের কাছে এ এক বিরাট যন্ত্রণা। তা বলে কি ভিড় হয় না! কিন্তু এ ভিড়ের চরিত্রই আলাদা। হুজুগে পাবলিক মেলার মাঠে কোথায় গানবাজনা হচ্ছে ঠিক সেখানে ভিড় করছে। আবার স্টলগুলোতে বাম্পার সেল সেখানে ফাস্টফুডের টানে সারাক্ষণ ভিড় লেগেই আছে। অথচ বড় প্রকাশক ছাড়া ছোট ও মাঝারিদের হাল দিনদিন খারাপ হচ্ছে। মেলার খরচ ওঠানো যাচ্ছে না। উৎস মানুষের স্টলেরও একই হাল। মাঝে মাঝেই হাপিত্যেশ করে বসে থাকা, কখন খদ্দের আসবে। অবস্থাটা খুব দ্রুত পাল্টে গেল। দলবেঁধে কলেজ ফেরত ছাত্রছাত্রীরা স্টলে বই নেড়ে চেড়ে দেখছে, দু-একটা বই কিনছে, পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলোর পাতা ওলটাচ্ছে, কয়েক বছর আগেও বইমেলার স্টলে আমরা এভাবেই উৎসাহিত হতাম। মেলার মাঠে মাইকে ঘোষকের কথার ফাঁকে ফাঁকে অসাধারণ সব গান বাজানো হত— তা-ও হারিয়ে গেছে। এখন যেসব শিল্পীর গান বাজানো হয় তাদের কারা নির্বাচিত করেন সে কথা না-ই বা তুললাম। তবুও এবারের বইমেলার কিছু অভিজ্ঞতা বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। পূর্ব মেদিনীপুরের স্কুল ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে এক শিক্ষক এলেন। এঁরা কিছু কিছু নির্বাচিত স্টলে গিয়ে স্কুলের পাঠাগারের জন্য বই সংগ্রহ করছিলেন। যে যেমন দিচ্ছে এঁরা তাতেই খুশি। আমরাও এদের কিছু বই দিতে পেরেছি। অল্পবয়সী ছাত্রীদের উৎসাহ দেখে ভাল লাগল। এছাড়াও উৎস মানুষের যেসব বই ছাপা নেই, তা কেন ছাপা হচ্ছে না, কবে হবে এসব প্রশ্নের জবাব প্রতিবারের মতো এবারেও দিতে হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি মফস্বল থেকে আসা পাঠক ক্রেতাদেরই উৎসাহ বেশি। আমাদের মতো স্টলগুলো এদের জন্যই আজও উৎসাহ পায়। আবার বইমেলায় আসার পথে আমাদের এক পাঠক বন্ধু পাড়ায় একজনকে বইমেলায় আসার কথা বলতেই শুনতে হল 'ওসব বইমেলা ফেলা তোদের জন্য'। বলাই বাহুল্য পাঠক বন্ধুটি সরকারি চাকুরে আর যাকে আসতে অনুরোধ করেছিলাম তিনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বল্প বেতনের চাকুরে। বইমেলায় আমাদের স্টল নির্বাচনের সময় ম্যাপে যেভাবে নকশা করা হয়েছিল মাঠে এসে দেখা গেল তা মানা হয় নি। আমাদের মতো চুনোপুঁটি প্রকাশকের প্রতিবাদে যে কেউ কান দেবেন না সেটাই স্বাভাবিক! বইমেলা যাঁরা চালান সেসব মানুষজনের নজর কাড়তে রেফারেন্স লাগে যা আমাদের নেই। একে তো দিন দিন বিক্রি কমছে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বইমেলার কর্তাদের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখানোর খেলা। এভাবে কতদিন বইমেলায় উৎস মানুষ টিঁকে থাকবে বলা কঠিন!

বইমেলায় উৎস মানুষের স্টলের সামনে পারমিতা, বরুণ, চিত্ত, পূরবী

উৎস মানুষের প্রতিবেদন

কোথায় বিজ্ঞান মানসিকতা?

বিবর্তন ভট্টাচার্য

২০১৪-এর বইমেলা শেষ। সাহিত্যের সাথে প্রচুর বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান মানসিকতা বিকাশের প্রচুর বই ও পত্রিকা বিক্রি হয়েছে, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বহু মানুষ কিনেছেন এই সব বই। পশ্চিমবঙ্গ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট সারা শীতকাল ধরে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক মেলা করেছে স্কুলে স্কুলে, এলাকায়, ক্লাবে ক্লাবে। বহু বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছে সারা পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু ৫০-৬০ বছরের এই প্রচার সাধারণ মানুষের মনের কোণে এখনও পৌঁছায় নি। দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল থেকে সরকারি অনুষ্ঠানে কুসংস্কার দূর করবার বড় বড় পোস্টার একফোঁটাও রেখাপাত করতে পেরেছে কিনা তা ২০১৪-এ ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা তার প্রমাণ।

১। অপয়া বউ

তারিখটা ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, মঙ্গলবার ভোর ৬টা। ৫টা গাড়ি করে মালদহ থেকে রায়গঞ্জে ফিরছিল একটি বিয়েবাড়ির দল। এর মধ্যে একটি বোলেরো গাড়ি গিয়ে ধাক্কা মারল একটা ১০ চাকা লরির সঙ্গে। গাড়িতে ১৫ জন ছিলেন। সাথে সাথে মারা গেলেন ১৩ জন। দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের ময়নাভিটার বাসিন্দা সৌতম রাজভরের সঙ্গে বিয়ে হয় বাগানপাড়ার মেয়ে রাধা রামের। অগ্নিসাক্ষী করে শপথ নিয়েছেন দুজন, সুখে-দুঃখে রাধার পাশে থাকবে সৌতম। কিন্তু এই অলক্ষুণে অপয়া বৌয়ের জন্যই এই দুর্ঘটনা। গাড়ি থেকে যৌতুক নামিয়ে দিয়ে বলে দিয়েছে এই অপয়া বৌকে কিছুতেই নিয়ে যাবে না গ্রামে। আমলটা শরৎচন্দ্রের সময়ের নয়, ২০১৪। যখন মানুষ সারা পৃথিবীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছে। কম্পিউটার, মোবাইল, ল্যাপটপ ছাড়া মানুষ ভাবতেই পারে না, তখন এই ঘটনা ঘটছে সারা ভারতের সব থেকে প্রগতিশীল রাজ্যে। রাধা গ্রামের মেয়ে, সোজাসাপটা আসল কথাটা বলে ফেলেছে। ও বলেছে ভোরবেলা কুয়াশা ছিল, এছাড়া সবাই তো মদ্যপ ছিল। চালকও মদ খেয়েছিল। দোষ তো ওদের, আর আমি অপয়া হয়ে গেলাম! মন্ত্রী, পঞ্চায়েত, দাদা, থানা ধরে ওকে পাঠানো হয়েছে শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু ভয় যে থেকেই যাচ্ছে মনের কোণে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যদি রাধার ওপর অত্যাচার করে? রাধার পিসিরা ওকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গাড়িতে চেপেছিল। কিন্তু জবরদস্তি এই দুই মহিলাকে নামিয়ে দিয়েছে বরপক্ষ।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিহত প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান মানসিক বিকাশের জন্য বা এই জঘন্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। বলেন নি অপয়া শুধু বউরা (মেয়েরা) কেন হবে? পয়া বা অপয়া বলে কিছু হয় না।

২। অবতার মোবাইল

মোবাইল খারাপ হোক আর ভাল হোক এখন শৌচাগার নেই এমন বাড়িতেও মোবাইল আছে। আর এই মোবাইলের দারুণ উপকার পেয়েছেন বিহারের বালঘাট জেলার আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দা বেণীরাম রঙ্গদালে। গ্রামের পাশে লাগোয়া জঙ্গলে প্রতিদিনই গরু মোষ ছাগল চরাতে যান বেণীরাম। সেদিনও চরাচ্ছিলেন। তারিখটা ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ মঙ্গলবার। হঠাৎ দেখেন একটি মহিষ উধাও। একটু খোঁজ করতেই একটি বাঘ লাফ দেয় বেণীরামের দিকে। চোখের সামনে কালো-হলুদ ডোরাকাটা দেখে একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সম্বিত ফিরতেই লাফ দিয়ে উনি একটা লম্বা গাছে উঠে পড়েন। এরপর শুরু হয় বাঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। বাঘিনীটির সঙ্গে দুটো বাচ্চা থাকায় ও গাছের গায়ে আঁচড় কাটতে থাকে। অবশেষে গাছের নীচেই হুঙ্কার ছাড়তে থাকে। বেণীরামের যখন প্রায় বেহুঁশ হওয়ার মতো অবস্থা, তখনই মোবাইল বেজে ওঠে। ওঁর মনে পড়ে যায় কোমরে গোঁজা মোবাইলটার কথা। তাড়াতাড়ি ওই ভয়ঙ্কর দুরবস্থার কথা গ্রামের সবাইকে জানান। গ্রামবাসীরা লাঠি, বল্লম, আগুন নিয়ে এসে গাছের তলায় জড়ো হন। ততক্ষণে বাচ্চাদের নিয়ে বাঘিনী চম্পট দিয়েছে। এরপর বেণীরামকে নিয়ে গ্রামের মানুষরা বাড়িতে ফিরে যান।

মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে বেণীরামের ধারণা রাধামাধবের দয়ায় ওঁর প্রাণ বেঁচেছে, তাই রাধামাধবের মন্দিরে স্থান পেয়েছে এই মোবাইল সেটটি। ফুলমালা দিয়ে রোজ পুজো হয় এই মোবাইল সেটটির। অবতার মোবাইলটি দর্শন করতে বহু গ্রাম থেকে বহু মানুষ আসেন। এই দুটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে এইটুকু বোঝা যে, শুধু বিজ্ঞান বই পড়লেই আর নস্বরবাদের বিবর্তন ঘটালেই পরিবর্তন হবে না, চাই সঠিক চেতনার বোধ ও বিজ্ঞান মানসিকতা।

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা উমা

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 20.00
৩৪ বর্ষ এপ্রিল-জুন ২০১৪ ২০ টাকা

প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ	সংকলন	৪২.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক	রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু	হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
এটা কী ওটা কেন	সংকলন	৫০.০০
যে গল্পের শেষ নেই	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫০.০০
আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান	সংকলন	৫০.০০
আরজ আলী মাতুব্বর	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
প্রতিরোধঙ্ম অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	নিরঞ্জন ধর	১০০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি	সংকলন	৬০.০০
প্রমিথিউসের পথে	সংকলন	৩৫.০০
লেখালিখিঙ্ম অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	সম্পাদিত	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	সংকলকঙ্ম প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৪০.০০
মূল্যবোধ	সংকলন	৫০.০০

প্রাপ্তিস্থানঙ্ম দীপক কুন্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প ১৮বি, গড়িয়াহাট রোজ (সাউথ), কলকাতা-৩১, জ্ঞানের আলো (যাদবপুর কফি হাউসের উল্টোদিকে), থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোজ, কলকাতা-২৬, ডঃ গৌতম মিস্ত্রি, ইন্স্ট্যান্ট ডায়গনস্টিক সার্ভিসেস, মন্ত্রিবাড়ি রোড, পো.-চৌমাথা, আগরতলা - ৭৯৯০০১। ফোন ঙ্ম (০৩৮১) ২৩০৮২৪৪/২৩১২৯৩৭।

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদকঙ্ম সমীরকুমার ঘোষ